ভালবাসা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

"ইন চার্চ অফ ইউ, ইন চার্চ অফ ইউ…"

ওইখানে তুমি থাকো। ওই সাদা বাড়িটায়, যার চূড়ায় শ্বেতপাথরের পরীটাকে বহু দূর থেকে দেখা যায়। নির্জন তোমাদের ব্যালকনি, বড় বড় জানলায় ভারী পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে লাগানো এয়ারকুলার। মসৃণ সবুজ লনে বুড়ো একটা স্প্যানিয়েল কুকুর ঘুমিয়ে আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, এসব এক পুরুষের ব্যাপার নয়। জন্মের পর থেকেই তুমি দেখেছো খিলান-গম্বুজ, বড় ঘর, ছাদের ওপর ডানামেলে-দেওয়া পরী— যা কেবলই উড়ে যেতে চায়। যায় না।

বিকেলের রাস্তায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে কালো যুবতী আয়া মন্থর পায়ে প্র্যাম ঠেলে নিয়ে চলেছে। কদাচিৎ দু-একজন ভবঘুরে লক্ষ্যহীন চোখ চেয়ে হেঁটে যায়। বড় সুন্দর অভিজাত নিস্তব্ধতা তোমাদের, তাই যদিও আমার পথে পড়ে না, তবু আমি মাঝে মাঝে তোমাদের এই নির্জন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঘুর পথে যাই।

আজ দেখলুম তোমাকে। তুমি একা হেঁটে যাচ্ছিলে।

যখন ক্বচিৎ কখনো তুমি এরকম হেঁটে যাও, তখনই বলতে কি তোমার সঙ্গে এক সমতলে আমার দেখা হয়। আজ যেমন। নইলে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখি তোমাদের মভ্ রঙের মোটর গাড়িতে। হুহু করে চলে যাও।

তোমাদের পুরোনো মোটর গাড়িটার কোনো গোলমাল ছিল কি আজ! কিংবা নিকেলের চশমা চোখে তোমাদের সেই বুড়ো ড্রাইভারটার!

অনেকদিন দেখা হয় নি। দেখলুম এই শীতকালে তুমি বেশ কৃশ হয়ে গেছ। সাদা শাড়ি পরেছিলে, তবু কচি সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছিল তোমাকে। সুন্দর অভ্যাস তোমার— শাড়ির আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীর ঢেকে দাও, মুখ নিচু করে হাঁটো— যেন কিছু খুঁজতে খুঁজতে চলেছ। নাকি পাছে কারো চোখে চোখ পড়ে যায় সেই ভয়েই তোমার ওই সতর্কতা! ও-রকম মুখ নিচু করে যাও বলেই বোধ হয় তুমি কোনো দিন লক্ষ্য করোনি আমায়। আজকেও না।

মোড়ের মাথায় রঙ্গন গাছের ছায়ায় যে লাল ডাকবাক্সটা আছে তুমি সেটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিলে। তোমাকে আর দেখা গেল না। এত কাছ দিয়ে গেলে আজ যে, বোধ হয় তোমার আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল একটুক্ষণের জন্য তোমার পিছু নিই। নিলুম না। কেননা ফাঁকা রাস্তার মোড় থেকে বেঁটে, মোটাসোটা, কালো টুপি পরা লাল ডাকবাক্সটা স্থির গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল তোমার পিছু নিতে গেলেই সে গটগট করে হেঁটে এসে আমার পথ আটকাবে।

একটু আগে আমি ওই মোড় পেরিয়ে এলুম। বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূরে এক গাড়িবারান্দার তলায় দেখলুম জটলা করছে পাড়ার বখাটে ছেলেরা। বড় রাস্তাতেও রয়েছে নির্বোধ পুরুষের ভিড়। একা ওইভাবে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে তুমি দূরে আছ,

সুরক্ষিত আছ, অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তুমি তত দূর নও। আমি তাই অনেকক্ষণ ভাবলুম তুমি ঠিকঠাক চলে যেতে পেরেছিলে কিনা।

তোমাদের পাড়া ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই কয়েকটা ভিখিরির ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রুক্ষ চুল, করুণ চোখ, কৃশ চেহারা। লক্ষ্য করলুম একটি ছেলের মাথায় ঠোঙার মুকুট, একটি মেয়ের গলায় শুকনো গাঁদা ফুলের মালা। কাছেই ফুটপাথের কোথাও বসে এতক্ষণ বর-বউ খেলছিল বোধ হয়। কিছু সময় তারা আমার পিছু নিল। 'দাও না, দাও না।' উল্টো দিক থেকে ধীর গতিতে হেঁটে আসছিল একজন পুলিস। কাছাকাছি হতে হঠাৎ কি ভেবে সে তার হাতে ব্যাটনটা দুলিয়ে বলল, 'ভাগ।' বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেলে সে একবার আমার দিকে চেয়ে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। আমিও হাসলুম। বাচ্চাগুলো দূর থেকে চেঁচিয়ে বোধ হয় আমাকেই বলছিল 'ভাগ! ভাগ!'

।। দুই ।।

রাত সোয়া ন'টায় সোমেনের পড়ার ঘরের পাশে হলঘর থেকে ওদের পুরোনো প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িটায় পিয়ানো টুংটাং বেজে উঠল! আমি দাঁড়িয়ে হাই তুললাম। সোমেন তার বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল।

চলে আসছিলুম, সোমেন ডাকল, 'মাস্টারমশাই।'

'বলো।'

'কাল সবাই বরানগর যাচ্ছি, মাসীমার বাড়ি। পড়বো না।'

'আচ্ছা।'

'আর মাস্টারমশাই···,বলে ও লাজুক মুখে একটু হাসল।

'কি হল ?'

কথা না বলে ও ইঙ্গিতে হলঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। হলঘর পেরিয়ে ওদের অন্দরমহল। আজ হলঘরটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে অন্ধকার থাকে। বললুম, 'তুমি না এস ও পি সি-তে বক্সিং করো! একটা অন্ধকার হলঘর পার হতে পারো না!' বলতে বলতে কাঁধে হাত রাখলুম। কিছুদিন আগে পৈতে হওয়ায় ওর মাথার চুল এখানো ছোটো ছোটো—আর দণ্ডীঘরের ব্রহ্মচর্যের আভা এখনো ওর সমস্ত শরীরে ফুটে আছে।

'এই ঘরে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন না! বেঁচে থাকতে যিনি তোমাকে অত ভালবাসতেন, মরার পর কি তিনি তোমাকে ভয় দেখাতে আসবেন ?'

শুনে সামান্য শিউরে উঠল সোমেন। আমি ওর মাথায় হাত রাখলুম। কখনো যখন হোম-টাস্কের খাতার দিকে ঝুঁকে থাকা ওর মনোযোগী মুখে টেবিল বাতির সবুজ ঢাকনার আলো এসে পড়ে, কিংবা যখন কখনো ভুলে যাওয়া পড়া মনে করার চেষ্টায় ও দাঁতের ঠোঁট চেপে, হাত মুঠো করে অসহায় চোখে টালমাটাল তাকায় তখন আমার কখনো মনে হয়—এই সুন্দর, পবিত্র ছেলেটি আমার। এই আমার ছেলে সোমেন—যার হাতে রাজ্যপাট দিয়ে খুব শীগগীরই একদিন আমি বানপ্রস্থে যাবো।

আমি হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সোমেন এক ছুটে অন্ধকার হলঘর পার হয়ে গেল।

আমাদের বাসার সদর দরজার ছিটকিনিটা বাইরে থেকেই খোলা যায়। প্রথমে দরজাটা টেনে বন্ধ করো। তারপর ডানদিকের পাল্লাটা আস্তে চেপে ধরো। খুব অল্প একটু

ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে দাও বাঁ হাতের আঙুল। এইবার আঙুলটা ডানদিকে বেঁকিয়ে দিলেই তুমি ছিটকিনির মুখটা নাগালে পাবে। সেটা ওপরে তুলে ঘোরাও। তারপর ছেড়ে দাও। ঠক করে ছিটকিনি খুলে যাবে।

রাত সাড়ে দশটায় কৌশলে সদরের ছিটকিনি খুলে, অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাতি জ্বলছে। মার বিছানায় মশারি ফেলা। মার জেগে থাকার কোনো শব্দ শোনা যায় না।

রান্নাঘরে আমার ভাতের ঢাকনা খুলে বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। মা টেরও পায় নি। আজকাল বড় সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে মা। বয়স হচ্ছে। কথা বলতে বলতেও হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে নেমে আসে মাথা। খেয়াল হতে চমকে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'কি বলছিলাম যেন!' আমি হেসে বলি, 'কিছু না মা, কিছু না।'

রান্নাঘরের জানলার একটা শার্সি ভাঙা। মেঝের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঝোল, আর তার সঙ্গে এখানে–ওখানে বেড়ালের পায়ের ছাপ ভাঙা শার্সিগুলা জানলাটা পর্যন্ত গেছে। ভাতের পাশে কালচে আর মেরুন রঙের দুটো তরকারি, হাতল ভাঙা কাপে হলুদ ডাল। রাতে ঠাণ্ডা এই খাবারের দিকে চেয়ে মনে হয় মুখে দিলে বড় বিস্বাদ লাগবে।

খেয়ে ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরাবো, মা ঘুমের মধ্যেই 'অঃ' শব্দ করে পাশ ফিরল।

'কে?'

'আমি।'

মা চৌকির শব্দ করে উঠে বলল, 'দেখ তো, একটা চিঠি এসেছে বিকেলে। চোখে ভাল দেখি না। দেখ তো। কর্তার চিঠি মনে হয়।'

মশারির ভিতর থেকে হাত বের করে মা আমার হাতে চিঠি দিল, 'জোরে পড়।'

কালচে রঙের পাকিস্তানী পোস্টকার্ডের ওপরে ইংরেজীতে লেখা— 'কালী'। তার নিচে–পাঠঃ "পরমকল্যাণবরেষু বাবা রম, ইতিপূর্বে তোমার নিকট কার্ডে পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়াছ কিনা জানাইও। তোমাদের চিঠি না পাইলে চাঞ্চল্য ও চিন্তা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখনি অসুখ–অশান্তি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায় চোখে ভালরূপ দেখিতে পারি না বলিয়া নানারূপ জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বর্তমান অবস্থা–ব্যবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তাড়াতাড়ি কোনো কিছু না হইলে অবস্থা ক্রমশ জটিল ও সঙ্কটাপন্ন হইবে। তোমার কাগজাত ঢাকা আসিলে অবশ্য খবর পাওয়া যাইত। অনিলের সহিত যোগাযোগ করিও। ঐ সঙ্গে কলিকাতা পাকিস্তানী হাই–কমিশনার বরাবর দরখাস্ত দিয়া তাহাতে অনুমতি পাইবার ব্যাপারে রিকমেণ্ড করাইয়া পাঠাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কারণ এখানকার ডি–আই–জি হইতে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য জানিবা। ···বলিয়াছিলাম, বরং মুসলমান হইব তবু ভিটা ছাড়িব না।···অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি····তোমরা নিকটে না থাকায় অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, রিকমেণ্ড থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে।···দেরি হইলে আরো বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িব···তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে মরিতে চাহি। তোমার গুড়া কাকিমার মাথার কিছু বিকৃতি দেখা দিয়াছে—আজ চার–পাঁচ মাস যাবৎ নানারূপ চিকিৎসা চলিতেছে।...সোনারপুরে আমাদের যে জমি তাহাতে অন্তত দুই চালা তোলার চেষ্টা করিও! বর্তমান যে দুঃসময় দেখা দিয়াছে

তাহাতে মিতব্যয়ী না হইলে নিরূপায় হইবা। সাবধানে থাকিও ও মঙ্গল জানাইও। অন্যান্য এক প্রকার। ইতি আং তোমার বাবা।"

চিঠি শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সারাদিন তুই করিস কি ? সার্টিফিকেটটার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করলে যদি হয় করিস না কেন! অনিলের কাছে যা —ও অত বড় চাকরি করে, ঠিক বের করে দেবে।'

'যাব।'

'যাস।' বুড়ো বয়সে এখন জেদ কমেছে লোকটার, এই বেলা নিয়ে আয়।' মা মশারির ভিতরে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, 'চোখে কেমন কুয়াশার মতো দেখি আজকাল। কর্তা আসবে, তার আগেই একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস তো!'

আমি মার মশারি তুলে দিয়ে ভিতরে পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুলুম। 'মশা ঢুকছে না!' বলে ছোট্টো একটু ধমক দিয়ে মা আমার পিঠে হাত রেখ বলল, 'কি এত খরচ করিস! এতদিন একটু-আধটু জমালে দুটে দোচালা সত্যিই উঠে যেত। একটু গাছ-গাছালি লাগাতে পারতুম। নিজেদের বাগানের ফল-পাকুড় খাই না কত দিন।'

'একটু আদর করো না, সোনা মা!'

।। তিন ।।

আমার সামনের রাস্তায় হঠাৎ পড়ে লাফিয়ে উঠল একটা লাল বল। এমন চমকে উঠেছিলুম! তারপরই শোনা গেল সামনের হলুদ বাড়িটার দেয়ালের আড়াল থেকে বাচ্চা ছেলেদের চীৎকার, 'ওভারবাউণ্ডারী··· ওভারবাউণ্ডারী! ···মিলনের একুশ!' শুনে আমি আপন মনে হেসে উঠলুম।

পিছনের পার্কটায় দেখে এলুম এক পাল কাকের সভা বসেছে। আর খোলা মাঠে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে খেলছে বাতাস। মোড় ফিরতেই মুখোমুখি দেখা হল সেই মোটা, বেঁটে, লাল ডাকবাক্সটার সঙ্গে। দূরে দেখা যায় তোমাদের বাড়ির চূড়ায় পরীটাকে—আকাশের দিকে বাড়ানো এক হাত —অন্য হাতে সে তার বাঁ দিকের স্তন ছুঁয়ে আছে।

তখন দুপুর। রাধাচূড়া গাছের তলায় জলের ড্রাম, পেতলের থালা, আর ছাতুর ঝুড়ি সাজিয়ে বসেছে এক অল্পবয়সী ছাতুওয়ালা। তাকে ঘিরে রিক্শাওয়ালাদের ভিড়। এক হাত খাবারের থালায় রেখে অন্য হাতে লোভী পাখিপক্ষীদের তাড়াতে তাড়াতে যখন মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে তখন মনে হয় ঐ খাবারের সঙ্গে আকাশ, মাটি ও উদ্ভিদের বড়ো মায়া মিশে আছে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে যাই।

চমৎকার দিন আজ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। শীতের খর বাতাস বইছে।

তুমি আজ কোথাও ছিলে না। যখন তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলুম তখন দেখি একটা ঘাস-ছাঁটা কল বাগানময় ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মালী। ব্যালকনিতে দুটে ডেকচেয়ার। তোমাদের অর্ধবৃত্তাকার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে একা একটা স্কুটার, যার রঙ ছানার জলের মতো সবুজ।

সারা দুপুর আমি আজ আর ভুলতে পারলুম না—ঐ ঘাস-ছাঁটা কল, দুটো ডেকচেয়ার, আর ঐ সবুজ একা একটা স্কুটার।

।। চার ।।

আজ প্রথম পিরিয়ডে আমি ক্লাসে ছাত্রদের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের ভিতরে তখনকার গার্হস্থ্য চিত্র আর সমাজজীবন বিষয়ে একটা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে জানলার কাছে এসে যখন দাঁড়ালুম তখন দেখা যাচ্ছে আকাশে নিচু একটু মেঘ। বৃষ্টি হবে কি! বৃষ্টির আগে ভেজা মাটির যে গন্ধ পাওয়া যায় আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম। বৃষ্টি এল না! শেষ ক্লাস ছিল সেভেন-এ। ওরা গেল ক্লাস লীগে ক্রিকেট খেলতে। টিফিনে তাই ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসছি, গিরিজা হালদার একটা কাগজ দিয়ে বলল, 'সই করুন।' চটপট সই করে দিলুম! হালদার গজগজ করতে করতে কমন-রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কিসে সই করলেন, একবার পড়েও দেখলেন না।' চেঁচিয়ে বললুম, 'যে কোনো আন্দোলনই করুন—আমি সঙ্গে আছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' বেরিয়ে এসে খুশী মনে দেখলুম ঝক্‌ঝক্ করছে দিন।

পাবলিক ইউরিন্যালের নোংরা দেয়ালে পেন্সিলে লেখা অনেক অশ্লীল কথার মধ্যে কে লিখে গেছে—গোপাল আর নাই। 'গোপাল' থেকে পেন্সিলের হাল্কা রেখা 'নাই'-তে এসে গভীর। যেন-বা হতাশা থেকে ক্রমে ক্রোধ! লেখা নেই, তবু মনে হয় হতাশার 'হায় গোপাল' থেকে শুরু শেষে এসে রাগ 'নাই কেন?' লেখা আছে— গোপাল আর নেই। আমি পড়লুম—'হায়! গোপাল!' পড়লুম, 'গোপাল আর নাই কেন?'

বেরিয়ে আসছি, দেখি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রামের স্টপে ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা মুখ। সুধাকর না! কলেজ টীমের দুর্দান্ত লেফট আউট ছিল! দেখি গায়ে চর্বি জমেছে, থল্‌থল্ করছে ভুঁড়ি, কাঁধে ঝুলছে শান্তিনিকেতনের ঝোলা ব্যাগ। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

ফার্স্ট ডিভিসনেও কিছুদিন খেলেছিল সুধাকর। তখন ওর দৌলতে ডে স্লিপে কত খেলা দেখেছি। মনে পড়ে লাইটহাউসে দুজনে দশ আনায় লাইন দিতে গেছি, দুটো অচেনা ছেলে লাইন থেকে ডেকে বলল, 'আপনি এস সেন না?' সুদাকর মাথা নাড়ল —হ্যাঁ। 'আসুন না, এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।' লাইনে দাঁড়িয়ে সুধাকর চাপা গলায় বলেছিল, 'কিরে শালা দেখলি!'

চার বছর আগে শেষ দেখা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিট্যালের সামনে। তখন ওর মায়ের ক্যান্সার। ইউটেরাসে। দুজনে চৌরঙ্গী পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম। বললে, 'খেলা ছাড়ার পরই একটা মজার চাকরি পেয়ে গেছি ভাই। কনস্ট্রাকশনে। কাজকর্ম কিছু বুঝি না, কিন্তু এধার-ওধার থেকে কেমন করে যেন পয়সা এসে যায়।' পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি ইম্‌মর‍্যাল নই, খেলার মাঠেও মার না খেলে কখনো মারিনি।' তখন শীত শেষ হয়ে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে, তবু সুধাকরের গায়ে ছিল একটা পুরোনো ব্লেজার—বুকের কাছে মনোগ্রাম করা, যেন চোখ পাকিয়ে বলছিল— আমি খেলোয়াড় সুধাকর।

আমি ওকে ডাকলুম না। দূর থেকে দেখলুম ধুতি-পাঞ্জাবি-চপ্পল পরা মোটা থল্‌থলে সুধাকর যেন সবাইকে দেখিয়ে চলন্ত ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে চটপটে পায়ে পা-দানিতে উঠে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় কফি হাউসে অনেকের সঙ্গে দেখা। অমর ফিরেছে বিলেত থেকে অনেক দিন পর। আড্ডা তাই জমজমাট ছিল। অমররা সিং। পাঞ্জাবী শিখ। বাঙালী হয়ে গেছে। আগে দাড়ি গোঁফ পাগড়ী ছিল না।

আজ দেখি জালে ঢাকা দাড়ি, মাথায় জরির চুমকি দেওয়া পাগড়ী। বললুম, 'আগে না তুই ছিলি মেকানাইজড শিখ! তবে আবার কেন দাড়ি গোঁফ পাগড়ী, হাতে কেন তোর বালা?

হাতজোড় করে বলল, 'রিলিজিয়ান নয় ভাই, এ আমার পলিটিক্স। বিলেতে গিয়ে দেখি ইণ্ডিয়ানদের পাত্তা দেয় না। আমার গায়ের রঙ ফরসা, অনেকেই সাহেব বলে ভুল করে, খাতির-যত্ন পাই। কেমন লেগে গেল সেন্টিমেন্টে। তাই দাড়ি গজিয়ে পাগড়ী বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—ইণ্ডিয়ানদের যা পাওনা তাই দাও আমাকে। খাতির চাই না।'

রাত আটটার সময় ওরা উঠে গেল মদের দোকানে। সেলিব্রেট করবে। আমি গেলুম না। যাওয়ার সময় তুলসী আড়ালে ডেকে বলে গেল, 'অনিমেষকে একবার দেখতে যাস। ওর অসুখ।'

'কি অসুখ!'

মুখ টিপে হেসে বলল, 'বলছিল, অসুখের নাম মীরা। দেখিস গিয়ে।'

।। পাঁচ ।।

রাত সাড়ে ন'টায় আমি লণ্ডনের এক অচেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। চারদিক হিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে। একটা দোতলা বাস হল্টে থেমে আছে, বাস-এর পিছনে বিজ্ঞাপন — 'সিনজানো'। চোখে পড়ে অদ্ভুত পুরোনো ধরনের পথিক লাইটপোস্ট, ভিক্টরীয় দালানের ভারী স্থাপত্য, পিছনে দূরে বহুতল স্কাইস্ক্র্যাপারের জানালায় আলোর আভাস। ওভারকোটের পকেটে আমার দুই হাত। আমি হেঁটে যাবো। সামনের যে-কোনো পাব-এ রহস্যময়ভাবে ঢুকে আমি খেয়ে নেবো এক গ্লাস বীয়ার, অল্প গুন-গুন করে গাইবো ঐ অচেনা শব্দটি যা কিনা কোনো মদের নাম — 'সি-ই-ন্-জা-আ-ন্-ও-ও'। ঘরে ফেরার আগে আমি কোনো হোটেলের বলরুমে ঢুকে নেচে নেবো দু চক্কর নাচ, 'হেঃ এ, টুইস্ট, টুইস্ট।'

আমি দূর বিদেশে পৌঁছে গেছি আজ। ঘন কুয়াশার পর্দা সরালেই দেখা যাবে আমার চারধারে জীবন্ত এই ছবি।

চেনা রাস্তাঘাট আজ আর চেনা যাচ্ছিল না। বিবর্ণ দেয়াল, ছেঁড়া পোস্টার, কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষ—এই সবই ঢাকা পড়েছিল! কলকাতায় বড় সুন্দর ছিল আজকের কুয়াশা। হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ধরিয়ে নিলুম একটা সিগারেট। ট্র্যাফিকের সবচেয়ে সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি ঝলসে উঠলে স্টেটবাসের গীয়ার বদলানোর শব্দ হয়েছিল। জ্বলে উঠল সবুজ। 'আস্তে ভাই ট্যাক্সিওয়ালা, বলতে বলতে আমি ডান হাত ট্র্যাফিক পুলিসের ভঙ্গীতে তুলে ধরে দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

আমার যাওয়ার কথা বকুলবাগান, সেদিকে না গিয়ে আমি মোড় নিলুম ডাইনে, এসে দাঁড়ালুম আদিগঙ্গার পোলের ওপর। আমার পায়ের তলা দিয়ে অন্ধকার রেলগাড়ির মতো বয়ে চলেছে জল। না, গঙ্গা কোথায়! এ তো রাইন! অদূরে ট্রাফল্‌গার স্কোয়ার থেকে ভেসে

আসছে রাতের ঘুমভাঙা কবুতরের পাখার শব্দ, আমার পিছনে অস্পষ্ট ইফেল টাওয়ার, সামনে বহুদূর স্ট্যাচু অব লিবার্টি বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে শঙ্খগঞ্জের দিকে ভেসে চলেছে গুদারা নৌকা। কুয়াশার আবডাল সরে গেলেই সব দেখা যাবে। কিংবা বলা যায়, কুয়াশার আবডালেই বহু দূরের সব কিছু পুরোনো এই কলকাতার হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি এসে গেছে। কাছে আসবার এই তো সুসময়—বর্ষায়, বা ঝড়ে, বা কুয়াশায়! ভালবাসায় একাকার হয়ে যায় পৃথিবী, সমুদ্র তার তট অতিক্রম করে উত্তাল হয়ে আসে স্থলভূমির দিকে, আমাদের চেনা শহরে ফুটে ওঠে অচেনা বিদেশের ছবি।

আজ রাতে তুমি একবারও খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে কি ? যদি দাঁড়াও, তবে—আমার মনে হয়, তুমি টের পাবে তোমাদের বাড়ির চূড়ার শ্বেতপাথরের পরীটা কুয়াশার আড়ালে তার মার্বেলের ভিত ছেড়ে উড়ে গেছে মোড়ের ওই লাল রঙের বেঁটে ডাকবাক্সটার কাছে। বহুকালের পুরোনো তাদের প্রেম— কেউ কখনো টেরও পায় নি। এখন পায়ের কোনো শব্দ না করে যদি তুমি ছাদে উঠে যেতে পারো তবে দেখবে — পরীটা সত্যিই নেই।

নাকি রাতের ডাকে চিঠিপত্র চলে গেছে বলে হাল্কা সেই ডাকবাক্সটাই বেলুনের মতো উড়ে এসেছে তোমাদের ছাদে! পরীটার কাছে! এখন তাই ডাকবাক্সটা খুঁজে না পেয়ে পৃথিবীর ভুলো মানুষেরা ভাবছে— কোথায় গেল আমাদের এতকালের চেনা সেই ডাকবাক্স! নাকি আমাদেরই রাস্তা ভুল!

।।ছয়।।

অনিমেষ একা থাকে। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম।

শুয়ে আছে। দেখলুম নাকটা অল্প ফুলে লাল হয়ে আছে। মুখের এখানে ওখানে ফাঁটা-ছেঁড়া, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত টানা লম্বা একটা কালশিটের দাগ।

আমাকে দেখে কনুইয়ে ভর রেখে উঠবার চেষ্টায় মুখ ভয়ঙ্কর বিকৃত করে বলল, 'চারটে লোক! বুঝলি, চারটে লোক ফিলজফি পাল্টে দিয়ে গেল।'

'কি হয়েছে তোর?'

'কি জানি! একা পড়ে আছি, সিগারেট এনে দেওয়ার লোক নেই। আর শালা দুপুরটা যে কি লম্বা মনে হয়!'

'চারটে লোক কারা ?'

পাশ ফিরে বলল, 'চিনি না! নাইট শো দেখে ট্যাক্সিতে ফিরছি, তখন রাত বারোটা। আমার ঘরের সামনে ঐ যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঠের মতো, বড় রাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে যেই মাঠে পা দিয়েছি, টের পেলুম ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আবছা চারটে লোক। তক্ষুণি কেন যেন মনে হল—বিপদ। ফিরে দেখলুম ট্যাক্সিটা ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার ডাকি। ততক্ষণে চারটে লোক চটপটে পায়ে এসে আমার চারধারে দাঁড়াল। মুখোমুখি যে, তার হাতে একটা সাইকেলের চেন। জিজ্ঞেস করল—তুমি শালা অনিমেষ চৌধুরী ? মীরার সঙ্গে তোমারই ভাব ? বোঁ করে চেনটা এসে মুখে লাগল। পড়ে যাচ্ছিলুম, ধরে বলল, ঘরে চল। ঘরে নিয়ে এল! আমি তালা খুললে চারজনই ঢুকল ঘরে। বলল, তোমাকে কাট মারতে হবে। আমি অল্প টলছিলুম, মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগছিল, তবু ওদের কথা বুঝলুম। বললুম, কেন ? বলল, মীরার সঙ্গে বিয়ে হবে হরির। ছেলেবেলা থেকে ওদের ভাব, মাঝখানে তুমি কে ? হরিকে আমি চিনি, মীরাদের বাসায় কাজেকর্মে আসে, ছুতোরের কাজ করে, জগুবাজারে দোকান আছে। আমি মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, মীরা শিক্ষিতা মেয়ে, হরিকে

বিয়ে করবে কেন ? আমার বুকে আঙুল ঠুকে বলল, কেন, শালা শিক্ষিতা মেয়ের শরীরে ফুল ফোটে না ? পাতা গজায় না ? হাসল, বিয়ে করতে না চায়, আমরা জোর করে দেব। সমাজের ব্যবস্থা আমরা পাল্টে দিচ্ছি শীগগীরই। তোমাকে চিঠি লিখতে হবে। লেখো। ওরা বলে গেল, আমি লিখলুম—প্রিয় মীরা, তোমার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। কাল থেকে তোমার সঙ্গে কাট। দেখা হলে আমাকে না চিনবার চেষ্টা ক'রো। আমি তোমাকে আর ভালবাসি না। ইতি অনুতপ্ত অনিমেষ। লেখা হলে ওরা একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দাও। দিলুম। তারপর ওরা আমাকে মারল, মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল মেঝেয়। বলে গেল, 'যদি কথার নড়চড় হয়ে তবে আবার দেখা হবে, না হলে গুডবাই।'

অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে চকমকে চোখে হাসল, মীরা এসেছিল দু' দিন পর। দরজা খুললাম না। বাইরে থেকেই বলল, 'অফিসে তোমাকে ফোন করে পাইনি। তুমি এত খারাপ বাংলা লেখো, জানতুম না। এ চিঠি তুমি লিখেছো ? শান্তভাবে বললুম, 'হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করল' 'কেন?' বললুম—

—'কি বললি!'

ধপ করে বালিশে মাথা ফেলে অনিমেষ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে হাত নাড়ল, 'দূর শালা! সে অনেক কথা। ছেড়ে দে। তোর কাছে যে ক'টা সিগারেট আছে দিয়ে যা।'

আমার সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বালিশের পাশে রাখল, 'মীরার কথা এখন আর ভাবছিই না। ভাবছি ঐ চারটে লোকের কথা। কী আত্মবিশ্বাস! আমাকে দিয়ে ঐ চিঠি লিখিয়ে নিল, আমার ঘরে ঢুকে মেরে গেল আমাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমার জোর কতখানি। আমি শালা হারামীর বাচ্ছা এতদিন ভদ্রলোক ...'

রাতে বেড়াল খুঁজতে গিয়ে মা পড়ে গিয়েছিল উনুনের ধারে। হুঁটুতে চোট। একটা আঙুল সামান্য পুড়েছে। ডাক্তার বলে গেল—হাই প্রেসার সাবধানে রাখবেন। খুব বিশ্রাম। আর নুন—বারণ।

পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'কেন মা, এত কাজকর্ম করতে যাও ?'

মা মিনমিন করে বলল, 'বউ আন।'

স্বপ্ন দেখলুম।

আমার চোখের সামনে দেয়ালের পর দেয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেয়ালের গায়ে কে যেন অবিশ্রাম চক্ দিয়ে লিখে যাচ্ছে—গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। কোথাও লেখা—'হায় গোপাল! কোথাও বা—'গোপাল আর নাই কেন?' আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিয়ের 'স্বাগতম' লিখবার লাল শালুতে উড়ছে করপোরেশনের বিজ্ঞাপন, বসন্ত— টীকা নিন। বিপদ— টীকা নিন। ভয়— টীকা নিন।

।। সাত ।।

দেখলুম স্টিয়ারিং হুইলে বন্ধ তোমার দুই অসহায় হাত, অহঙ্কারে একটু উঁচু তোমার মাথা। কপালের ওপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা ঘুরলি। দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছো। তোমার কপালে ঘাম। তোমার মুখ লাল। পাশে খাকী শার্ট পরা নিকেলের চশমা চোখে বুড়ো সেই ড্রাইভার। একটু ডান দিকে হেলে সে তার একখানি সাবধানী হাত বাড়িয়ে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তোমার হাতের দিকে।

বড় ভালবাসায় তোমাকে আগলে নিয়ে গেল তোমাদের পুরোনো মভ্ রঙের গাড়ি। মোড়ের বেঁটে মোটা লাল ডাকবাক্সটা তার কালো টুপি পরা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিৎকার

করে বলল, 'হ্যাপি মোটোরিং মাদ্‌মোয়াজেল, হ্যাপি মোটোরিং!' বাড়ির চূড়া থেকে শ্বেতপাথরের পরীটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে মাথা ঘুরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত একবার দেখে নিল— কোনো বিপদ আছে কিনা। যত দূরেই যাও, সে তোমাকে ঠিক চোখে চোখে রাখে।

যদিও একটু টাল খাচ্ছিল তোমার গাড়ি, তবু বলি, তুমি অনেকটা শিখে গেছ। আর ক'দিন পরেই তুমি তোমার গাড়ি একা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

চোখ বুজে দেখলুম, দূরে রাসবিহারীর জংশনে ট্রাফিকের লাল আলোয় থেমে আছো তুমি।

থেমেছিল ? নাকি অপেক্ষা করেছিলে ?

দেখো একদিন আমি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দাঁড়াবো তোমাদের ঐ মভ্ রঙের মোটর গাড়িটার মুখোমুখি। চেঁচিয়ে হয়তো বলব, 'বাঁচাও,' কিংবা হয়তো বলব, 'মারো আমাকে।' কুয়াশায় বা ঝড়ে বা বৃষ্টিপাতে কোনোদিন সেই সুসময় দেখা দিলে, তখন আর ওই দুই শব্দের আলাদা মানে নেই।

।। আট ।।

ফেব্রুয়ারী। কলকাতার এবারের শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম। রাস্তায় খুব ধুলো উড়ছে। চারদিকেই রাগী ও বিরক্ত মানুষের মুখ।

বিদায়ী শীতের সম্মানে একদিন স্কুল কামাই করা গেল।'ম্যাটিনী'তে বেলেল্লা একটা হিন্দী ছবি দেখলুম। আমি আর তুলসী। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি। লবীতে দাঁড়িয়ে তুলসী হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছিল। বললুম, 'তোর জমবে না কিছুই। তোর হাতে জল দাঁড়ায় না।' অসময়ে বৃষ্টি, তবু রাস্তায় জল জমে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ। হাতে স্যান্ডেল, কাপড় গুটিয়ে দু'জনে ছপ করে জলে নামলুম। হঠাৎ অকারণে খুশী গলায় তুলসী বলল, 'পৃথিবী জায়গাটা মন্দ নয়, কী বলিস!'

পাড়ার চেনা ডাক্তার ধরে একদিন টি এ বি সি দিয়ে দিল। দু'দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। মা কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেল বারবার। এমন ভাব— কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস, হতভাগা ছেলে, এবার পেয়েছি তোকে। তৃতীয় দিনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলুম। সকালেই দেখি, মা বাক্স খুলে কবেকার পুরোনো লালপেড়ে গরদের শাড়িটা বের করে পরেছে। 'কি ব্যাপার ?' মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হাসল, 'কাল রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।' মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর জ্বরটাও সারল। কালীঘাটে একটু পূজো দিয়ে আসি।'

আমি আর গিরিজা হালদার স্কুল থেকে একসঙ্গে বেরোলুম একদিন। হালদার গলা নামিয়ে বলল, 'আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি আছে মশাই। আপনাকে বলব একদিন।' পরমুহূর্তেই রুমাল বের করে বলল, 'গরম পড়ে গেল।' রেস্টুরেন্টে বসলুম দু'জনে, গিরিজা হালদার কাটলেট খেল না, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো টোস্ট। আমার মশাই নিরামিষ। দেখেন না হিন্দুর বিধবারা কতদিন বাঁচে।' হালদার প্রাণায়াম-টানায়াম করে। দম বন্ধ করে এক গ্লাস জল খেয়ে মুখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ্য করেছেন কলকাতায় অনেকদিন কিছুই ঘটছে না! না লাঠি চার্জ, না গোলাগুলি, না কারফিউ। তেমন বড় বড় একটা মিছিলও দেখছি না বহুকাল। লোকগুলো মরে গেছে, কি বলেন !' অন্যমনস্কভাবে বললুম, 'হুঁ।' হালদার টেবিলে আঙুল বাজিয়ে গুনগুন করল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে…'

দূর গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপর উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। অন্যমনে সাড়া দিই— 'যাই।'

রাতে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম, 'মা, ও মা তুমি আমায় ডাকলে।' মা জেগে উঠে অবাক গলায় বলল, 'না তো' বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে বলল, 'ঘুমো।' চৌকির শব্দ করে পাশ ফিরল মা, বলল, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না রে!' আমি নিঃশব্দে হাসলুম, 'না তো!'

তারপর অনেকক্ষণ জেগে থাকি। মারও ঘুম আসে না। বলে, 'সারাদিন কী যে করিস! ঘুরে ঘুরে আত্মীয়-স্বজনদের একটু খোঁজখবরও তো নিতে হয় ! আমি মরলে আর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে কে না কে !' মার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'বুঝতেও পারি না, কে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে। একটু খোঁজ নিস।' জাবাব দি, 'কে কোথায় থাকে মা !' মা আস্তে আস্তে বলে যায়, 'কেন, মাঝেরহাটে তোর রাঙা কাকীমা, কাঁচড়াপাড়ায় সোনা ভাই···' শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মনে পড়ে, ছুটির এক দুপুরে বসে ছিলুম ছোট একটা চায়ের দোকানে। চারটে টেবিল, প্রতি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার, আর সবুজ পর্দাওলা দুটো কেবিন খালি পড়ে আছে। মাছি ওড়ার শব্দ শোনা যায়। দেয়ালে ভয়ঙ্কর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার। দুপুরের ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে অনেকক্ষণ একা বসেছিলুম। এ সময় দরজায় এসে দাঁড়ালেন সাদা চাদর গায়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক। চোখে চোখ পড়তেই আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। বড় দয়ালু ওঁর চোখ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম উনি মনে মনে বললেন, 'এই যে, কী খবর ?' তটস্থ আমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে উত্তর দিলুম 'এই যে, সব ভালো তো?' পরমুহূর্তেই উনি চোখ সরিয়ে নিলেন, গিয়ে বসলেন কোণের একটা চেয়ারে, পত্রিকা খুলে মুখ আড়াল করে নিলেন। আমি টেবিলের কাছে আমার অন্ধকার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। সেই ভাবটুকু তারপর কেটে গিয়েছিল, যখন সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে তুলতে এসে চা দিয়ে গেল।

একদিন স্কুলে এল টেলিফোন ! 'শীগগীর বাড়িতে আসুন।' শরীর হিম হয়ে এল। রিসিভার নামিয়ে রাখলুম আস্তে আস্তে। দীর্ঘদিন ধরে যেন এ রকম একটি আহ্বানেরই ভয় ছিল আমার। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে 'মা' এই শব্দ বেজে উঠেছিল। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি এসে দেখলুম ঘরে চারপাঁচজন পাড়া-পড়শী, বালিশে মার নিবন্ত মুখ, আধখোলা চোখ, ভয়ঙ্কর লাল ঠোঁট ফ্যাকাসে। ডাক্তার ব্লাডপ্রেসারের পারদের দিকে চেয়ে আছে। বলল···'তাড়াতাড়ি করুন।' বুঝতে না পেরে আমি চারদিকে চেয়ে বললুম, 'কী ?' 'আবার কে যেন বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন।' আমি বুঝতে পারলুম না, বাচ্চা ছেলের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী ?' বাড়িওয়ালার বউ আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বলল, 'যা তারকেশ্বরে মানত করে আয় !'

পরদিন। আমি তারকেশ্বর থেকে ফিরছিলুম। ভিড়ের ট্রেন। আমি বসবার জায়গা পাইনি। ট্রেন থামছে। প্রতিবার আমি মফস্বলের লোকের মতো নিজেকেই জিজ্ঞেস করছি, 'এটা কি হাওড়া ? এই কি হাওড়া ?' অনেক ঘাড়, অনেক মাথার জঙ্গল সামনে, আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করলুম। হঠাৎ এক ঝলক তোতো জলে ভেসে গেল মুখ,কষ বেয়ে জামা-কাপড় ভাসিয়ে দিল, 'এটা কি হাওড়া' আবার এই প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি চোখের সামনে পড়ছে কালো চাদর, ঝড়ের মতো ছুটেছে ট্রেন, অথচ যেন বাতাস লাগছে না। পড়ে যাচ্ছি, কয়েকটা হাত আমাকে ধরল। টের পেলুম, আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর সব শব্দ—যেন আমি আবার মায়ের কোলের সেই শিশু রম—এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ব। তবু সেই আধ-চেতনার মধ্যে আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আপনারা সবাই শুনুন। আমি রমেন। আমার মায়ের বড়ো অসুখ। দু'দিন আমি তাই কিছুই খাইনি।' আমি বলতে চাইছিলুম, 'আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী।' আমার প্রাণপণে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি

আজ আপনাদের ইচ্ছাশক্তিগুলি ভিক্ষা চাই। আপনাদের আশীর্বাদগুলি ভিক্ষা চাই।' ট্রেনের মেঝেয় ঘোর অন্ধকারের ভিতরে দুটো সাদা পা। যেন চেনা ! মুখ দেখা যায় না, তবু বুঝলুম সেই বুড়ো ভদ্রলোক ; আজও তার চোখ কথা বলছিল। 'আমি তোমার জন্যই এসেছি রমেন। তুমি ভাগ্যবান। চলে এসো।' আমি কাঁদছিলুম, 'আমার মার বড় অসুখ। আমার বাবা বিদেশে পড়ে আছে।' সহজ উত্তর দিল না তার চোখ, বলল, 'জীবন ও মৃত্যুই কিছু লোকের দেখাশোনা করে ; কিছু লোককে দেখে ভাগ্য ; কিছু লোককে ধর্ম এসে নিয়ে যায়।'

ভাল হয়ে গেলে মা একদিন চিন্তিত মুখে বলল, 'চোখে ভাল দেখি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস !' হাসলুম, 'কই !' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, 'আর কর্তার সার্টিফিকেটটা ? সেটা পেলি না !'

।। নয় ।।

তখন বিকেল। পাকিস্তানী হাই-কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে যাবো, এমন সময় হঠাৎ দেখি —তুমি! শিকড়শুদ্ধ আমার ডালপালা নাড়া খেয়ে গেল।

বলতে কি, স্কুটারের পিছনের সীটে তোমাকে মানায় না। এত খোলামেলা আর এত ভিড়ের মধ্যে।

দেখলুম সবুজ রুমালে ঘিরেছো মুখ, আজ নীল শাড়ি পেরেছিলে, স্কুটারের পিছনের সীটে তুমি জড়োসড়ো, টালমাটাল। চওড়া পুরুষের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হাসছিলে ভয় পাওয়া হাসি—'পুড়ে গেলু—উ-উম।'

তারপরই অবহেলায় আমাকে পিছনে ফেলে রেখে ছুটে গেল তোমাদের স্কুটার। যেতে যেতে আচমকা ঘুরে গেল বাঁয়ে—পড়ো পড়ো হল, পড়ে গেল না। তোমরা গেলে পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

আমি গড়িয়াহাট রোড ধরলুম। অপরাহ্নের আলোয় ফুটপাথে আমার দীর্ঘ ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অচেনা মানুষ। তাদের ছায়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনেই ট্রাফিক পুলিসের উত্তোলিত হাত, আর গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে আছে। একজন হকার আমাকে উদ্দেশ্য করে ধীর গম্ভীর গলায় হাঁকল, 'গেঞ্জি…!' এসব কিছুই আমি তেমন খেয়াল করলুম না। আমার মন গুনগুন করছিল, কেন তুমি কোনো দিনই লক্ষ্য করলে না আমায়! 'হায়, আমি যে আছি তুমি তা জানোই না !'

রাতে ঘুম না এলে জেগে থেকে মাঝে মাঝে সাধ হয়, তুমি এসে একদিন বলবে, 'আমাকে চাও ?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমি শান্ত চোখে চেয়ে বলব, 'চাই না।'

জমা খরচ

কি বুঝছো মুখুজ্জে ? চল্লিশ পেরিয়ে জীবনের এক আধটা হিসেব কষে ফেলা উচিত ছিল তোমার। একদিন ছুটি টুটি দেখে বরং একটা খাতা নিয়ে বসে যাও। একদিকে লেখ জমা, অন্য ধারে খরচ। ঐ যেমন অ্যাকাউন্ট্যান্টরা ডেবিট ক্রেডিট লেখে আর কি ?

জমার ঘরে প্রথমেই লেখ, জন্ম। ওটা প্লাস পয়েন্ট। একটা আর্নিং তো বটেই। কিন্তু আয়ুটাকে জমার ঘরে রেখো না। জন্মের পর থেকে আয়ু আর জমা হয় না। ওটা খরচ বলে ধরো।

ব্যালান্স শীটটার দিকে একবার তাকাও, ভাল দেখাচ্ছে না ? জমা, জন্ম। খরচ, আয়ু।

জন্মের পর একরোখা বহুদূর চলে এসেছো। টর্চের আলোটা একটু পিছন দিকে ঘুরিয়ে ফেলবে নাকি ? মগজের ব্যাটারি এখন আর তেমন জোরালো নয় হে। আলো একটু টিমটিমে। তবু দেখা যায়। একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছো, মাটির দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ? একটা লেবু গাছ ! আর ঐ মস্ত সেই নদী ! শীতে দুধসাদা চর জেগে ওঠে বুকে, ভর বর্ষায় রেলগাড়ির মতো বয়ে যায়!

এসব কোনো খাতেই লিখো না মুখুজ্জে। ওগুলো না জমা, না খরচ। ঐ সেই বাঘের মতো রাগী লোকটা সন্ধ্যার আবছায়ায় পুবমুখো মস্ত ডেক চেয়ারে বসে আছে বারান্দায় ! চেনো তো ! আর কারো বশ মানেনি কখনো, কেবল তোমার কাছে মেনেছিল। তোমার ইস্কুলের হাতের লেখা পর্যন্ত চুপি চুপি লিখে দিত, ভুলে গেছ ? কোন খাতে ধরবে তোমার দাদুকে ?

জমার ঘরে ধরলে ? ভুল করলে না তো ? একটু ভেবে দেখ। বরং কেটে দাও। কোনো খাতেই ধোরো না।

ময়ূরটার কথা লিখবে নাকি ? সত্যি বটে, গোলোকপুরের জমিদার বাড়ির মস্ত উঠোনে পাম গাছের নিচে ওকে তুমি বহুবার পেখম ধরে থাকতে দেখেছো। চালচিত্রের মতো রঙীন বিস্ময়। কিন্তু বলো, বিস্ময় আমাদের কোন কাজে লাগে ? আমাদের মূলধন জমার খাতে সৌন্দর্যের কোনো ভূমিকাই নেই।

বরং জমার খাতে ধরতে পারো তোমার জেঠীমার হাতে ডাল ফোড়নের গন্ধটাকে। ঐ অসম্ভব সুন্দর ডাল দিয়ে থাবাথাবি করে কতজন ভাইবোন মিলে এক থালায় ভাত মেখে খেতে।

আর বর্ষায় মুকুন্দর ঘানীঘরের পিছনে যে কদমফুল ফুটত ! যদি খুব ইচ্ছে হয় তবে ওটাকেও জমার ঘরেই ধরতে পারো। তবে আমি বলি ফুলটুল জীবনে খুব একটা কাজে লাগে না। কদম ফুল অবশ্য লেগেছিল। পাপড়ি ছিঁড়ে গোল মুণ্ডুটা দিয়ে তোমরা ফুটবল খেলতে শিখলে।

প্রথম এরোপ্লেন দেখার কথা মনে পড়ে ? টর্চটা ভাল করে ফেল। দেখতে পাবে। ঐ যে কলকাতার মনোহরপুকুরের সেই দোতলার ঘর ? দেশের বাড়ি, নদী, লেবু বন, দাদু সবকিছু থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল তোমাকে। সারাদিন মন খারাপ।পৃথিবী জুড়ে তখন বিশাল এক যুদ্ধ চলেছে। এরোপ্লেনের আওয়াজ পেলেই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে তুমি। মাথাটা উঁচুতে তুলতে। তুলতে তুলতে মাথা লটকে যেত পিঠের সঙ্গে। এরোপ্লেন যেত ঝাঁক বেঁধে। তার মধ্যে একটা এরোপ্লেন দলছুট হয়ে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে আবার উড়ে গেল।

তোমার শৈশব মাখামাখি হয়ে আছে রেলগাড়ি আর এরোপ্লেনে। তোমার ভিতরে জঙ্গল, পাহাড়, নদী, কুয়াশা, চাবাগান ঢুকে পড়েছিল কবে ! আজও তুমি তাই নিজের চারদিকটা স্পষ্ট করে দেখতে পাও না। মাঝে মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকো। তোমার মধ্যে রেল লাইন দিয়ে গাড়ি বহুদূরে চলে যায়, আকাশ পেরোয় বিষণ্ন এরোপ্লেনের শব্দ, অবিরল নদী বইতে থাকে। তোমার সময় যায় বৃথা। মুখুজ্জে, এগুলো তোমার খরচের দিকে ধরে রাখো।

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি বহুবার শুনিয়েছো লোককে। কাটিহারের সেই ভোরবেলা, শীতশেষের কুয়াশামাখা আবছায়ায় শিমূল বা মাদার গাছের মগডাল থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল শৈশবের নির্মোক। তুমি জেগে উঠলে। সত্যি নাকি মুখুজ্জে ? ঠিক এরকম হয়েছিল ?

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি একদিন বড় হয়ে বলেছিলে তোমার ভালবাসার যুবতীটিকে।

সে বলল, যাঃ।

সত্যি। তুমি বুঝবে না বুলু। এরকমই হয়েছিল।

কোকিলের ডাক আমি তো কত শুনেছি ! কোনোদিন আমার সেরকম হয় নি তো !

আঃ, কোকিলের ডাকটাই তো আর বড় কথা নয়।

তবে ?

সে যে সেই বিশেষ মুহূর্তে ডেকে উঠল সেইটেই বড় কথা।

বিশেষ মুহূর্তটা কিসের ?

শিশু বয়সের অবচেতনার ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ল যে।

যাঃ, বানানো কথা।

মুখুজ্জে, আজও তুমি ঠিক করতে পারোনি, কোকিলটাকে কোন খাতে ধরবে। কিন্তু কোনো না কোনো খাতে ধরতেই হবে যে, ওটা যে তোমার জীবনকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল।

ধরো, জমার খাতেই ধরো।

কোকিলের ডাকের পরেই এল মঞ্জু। মঞ্জুই তো ? ঠিক বলছি না ! মঞ্জুর মতো সুন্দর মেয়ে সেই বয়সে তুমি আর দেখনি। বব চুল, ফর্সা, টুকটুকে, মেম ছাঁটের ফ্রক। এর কথাও তুমি বহুবার বলেছো।

মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতে। মঞ্জুও তোমাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু সেই বয়সের টান কি সহজে ছাড়ে। ওদের বাড়ির আনাচ–কানাচ দিয়ে ঘুরতে, গুলতিতে পাখি মারবার চেষ্টা করতে, বড় গাছে উঠে যেতে। দেখানোর মতো এইসব বীরত্বই সম্বল ছিল তোমার।

তারপর একদিন নিজেদের বাগানে খেলতে খেলতে মঞ্জু একদিন ফটকের কাছে ছুটে এসে ডাক দিল, রতু! এই রতু!

তুমি পালাচ্ছিলে ডাক শুনে। মঞ্জু ছাড়েনি তবু। ফটক খুলে পাথরকুচির রাস্তায় কচি পায়ের শব্দ তুলে দৌড়ে এসে হাত ধরল। বড় বড় চোখে চেয়ে রইল মুখের দিকে, অবাক হয়ে।

এত ডাকছি, শুনতে পাওনি ?

ডাকছিলে ? ও, তাহলে শুনতে পাইনি।

ঠিক শুনেছো। দুষ্টু কোথাকার ! ভারী ডাঁট তো তোমার।

তুমি কথা বলতেই পারোনি।

মঞ্জু হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তোমাকে, ওদের বাগানে। পরীর মতো মেয়েরা খেলছে ওদের বাগানে, গাছে চড়ছে, হাসছে, চেঁচাচ্ছে। চোরের মতো দাঁড়িয়েছিলে তুমি।

মঞ্জু দৌড়ে একটা পেয়ারা এনে তোমার আড়ষ্ট হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, খাও রতু।

খাবো ?

তবে পেয়ারা দিয়ে কি করে লোক ? খায়ই তো !

কী যে সুগন্ধ মাখানো ছিল পেয়ারাটার গায়ে, আজও মনে আছে তোমার। হয়তো পাউডার বা স্নোয়ের গন্ধ, হয়তো তা মঞ্জুরই গন্ধ।

পেয়ারাটাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে !

ইস্কুলে চোরের মার খেতে তুমি রোজ। মার খেতে খালাসীপট্টিতে, মেছোবাজারে, বাবুপাড়ায়। দুষ্টু ছিলে, দাঙ্গাবাজছিলে, তাই মার খেতে খেতে বড় হলে। সবচেয়ে বেশী লেগেছিল একদিন। ইস্কুল থেকে ফেরার সময়ে খালাসীপট্টিতে একটা লোক হঠাৎ অকারণে কোথা থেকে সুমুখে এসে তোমার পথ আটকাল।

তুমি পাশ কাটাতে চেষ্টা করছিলে।

লোকটা হঠাৎ বলল 'শুয়ারকা বাচ্চা', তারপর বিনা কারণে তোমার কান ধরে গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। সেই চড়টা আজও জমা আছে। কিছুতেই ভোলোনি। শোধ নেওয়া হয়নি। তুমি শোধ নিতে ভালবাস না কিন্তু আজও ভাবো, এই চড়টার শোধবোধ হওয়া দরকার। চড়টাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে ?

বড় একটা শ্বাস ফেললে ? ফেল। তোমার অনেক নিশ্বাস জমা হয়ে আছে।

বেশ গুছিয়ে বসেছো। প্রথম যৌবনের ততটা টানাটানির সংসার আর নেই। দুবেলা দুটো ডালমন্দ খাও। ঘরে দু-চারটে দামী জিনিসপত্রও নেই কি ? আছে ছেলে, মেয়ে, বউ।

বউ সেই মঞ্জু নয়, বুলুও নয়। এ অন্য একজন, যাকে তুমি আজও চেনোনি !

বউ বলে, তুমি অপদার্থ, ভীতু। বদমাশ। কখনো বলে, তোমাকে ভালবাসি।

এইসব কথাগুলো হিসেবে ফেলে দেখ তো, কোনটা জমা কোনটা খরচ।

পারছ না মুখুজ্জে, গুলিয়ে যাচ্ছে।

ঐ যে একটি চিঠি এল তোমার নামে সেদিন। কী সুন্দর এক অচেনা মেয়ের চিঠি।

পড়ো মুখুজ্জে। লিখছে ঃ আপনার একটুখানি বেঁচে থাকা আমার কাছে অনেকখানি। প্রণাম করলাম।

কোন খাতে চিঠিটাকে ধরছ ? জামা ! হাসালে।

বড্ড জট পাকিয়ে যাচ্ছে হিসেব-নিকেশ মুখুজ্জে। মেয়ে এসে গলা জড়িয়ে বলছে, বাবি, তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। অবোলা ছোট্ট ছেলেটা তোমাকে দেখলেই দুহাত তুলে ঝাঁপিয়ে আসে।

এগুলো জামার খাতে ধরবে না!

সুখ আর দুঃখগুলোকে আলাদা করে করে আঁটি বেঁধে রেখেছো, কিন্তু কোন খাতে যাবে তা ধরোনি। সব সুখই তো আর জমা নয়। সব দুঃখই যেমন নয় খরচ।

কাঁদছো মুখুজ্জে ! কাঁদো। এই মধ্য বা শেষ যৌবনে একটু আধটু কাঁদতেই হয় মানুষকে। হিসেবের সবে শুরু কিনা।

কার্যকারণ

রাত দুটোয় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি সিগারেট জ্বাললুম। নিঃসাড় ঘুমে অচেতন আমার বউ সোনামন তা জানতেও পারল না। সারা বিকেল আমার সিগারেটের প্যাকেট লুকোনো ছিল তার হাতব্যাগে। খেয়াল করে নি সোনামন, বিছানায় যাওয়ার আগে অবহেলায় সে আমাদের দুই বালিশের ফাঁকে রেখেছিল ব্যাগটা আমি তা দেখে রেখেছিলাম।

বিয়ের একমাস আগে আমার গ্যাস্ট্রিকের ব্যথাটা বেড়ে গেল খুব। ব্যথা লুকিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতাম। পেট আর বুকের মাঝখানে একটা বিন্দুতে ব্যথাটা প্রথমে শুরু হত। ফুলের কলির মতো। তারপরেই ছিল তার আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলে দেওয়া। কিছু খেলেই কমে যেত। তারপর আবার গোড়া থেকে সে শুরু করত। সোনামন যখন রাস্তায় আমার পাশে হাঁটত, ট্যাক্সিতে ঢলে পড়ত আমার কাঁধে, কিংবা রেস্টুরেন্টে বসে চাপা ঠোঁটের হাসিটি হাসতে হাসতে চায়ে চিনি মেশাতো এখন আমি বুক-জোড়া টক জল আর কামড়ে ধরা ব্যথাটা গিলে রেখে অনায়াসে হাসতাম, কথা বলতাম। ওকে টের পেতে দিতাম না। শুধু মাঝে মাঝে সোনামন চমকে উঠে বলত— তোমাকে অত সাদা দেখাচ্ছে কেন মানিকসোনা (আমরা পরস্পরকে নানা নামে ডাকি) ? আমি শান্ত গলায় উত্তর দিতাম— বোধহয় আলোর জন্য। ও বিশ্বাস করত না। বলত—আলো না, তোমাকে কেমন ক্লান্তও দেখাচ্ছে ! কী হয়েছে ? আমি হাসতাম। হেসেই ধরিয়ে নিতাম সিগারেট। ঐ সময়টুকুর মধ্যেই আমি কৌশলে সোনামনকে অন্য কোনো বিষয়ে নিয়ে যেতাম নিজেকে আড়াল করে। আমি কখনো লক্ষ্যই করতাম না, আমি কত সিগারেট খাই। সোনামনের সঙ্গে জীবনে প্রথম এবং একমাত্র প্রেম করার সময়ে আমি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। কেননা দেখা হলে বা দেখা হওয়ার আগের কিছুটা সময়ে আমার শরীর কাঁপত, স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ত প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নেওয়া আমার ছিল প্রিয় অভ্যাস। বিবাদে, আনন্দে কিংবা উত্তেজনায় আমার কেবলই ছিল সিগারেট আর সিগারেট। সিগারেটের চেয়ে স্বাদু কিছুই ছিল না।

বিয়ের একমাস আগে আমরা একটা ইতর ট্যাক্সিওয়ালার পাল্লায় পড়েছিলাম। গঙ্গার ধার থেকে সে আমাদের ঘুরপথে নিয়ে যাচ্ছিল। জোড়া ছেলে-মেয়ে উঠলে ওটা তাদের অভ্যাস। আমি তাকে রেড রোড দিয়ে বালিগঞ্জের পথ বললাম, সে আমাদের অন্যমনস্ক দেখে সোজা উঠে এল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। পর পর সে অবাধ্যতা করে যাচ্ছিল। গাড়িতে তার মুখের সামনে লাগানো ছোট্ট আয়নাটায় আমি তার রুক্ষ মুখে বিচ্ছিরি একটু হাসিও দেখতে পেয়েছিলাম।— আমি ড্রাইভারকে লক্ষ্য করছি দেখে সোনামন রাগ করে বলল—তুমি কেবল ঐদিকেই চেয়ে আছো। ওখানে কী! আমি তোমার ডানপাশে। আমি মৃদু হেসে সোনামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল আয়নার দিকে। নির্জন গুরুসদয় রোডে গাড়ি ঢুকলে আমি শান্ত গলায় ড্রাইভারকে থামতে বললাম। ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট আর জিভের শব্দ করল। সোনামন

আমার হাত আঁকড়ে বলল, এখানে কেন ? আমি হেসে বললাম— বাকীটুকু হেঁটে যাবো, সোনামন। বিয়ের আগে একটু পয়সা বাঁচাই।

সোনামন নেমে ফুটপাথে দাঁড়াতেই আমি ট্যাক্সিটা ঘুরে ড্রাইভারের দরজায় গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেললাম। কী করছিলাম তা আমার খেয়াল ছিল না। আঠাশ উনত্রিশ বছর বয়সের শক্ত কাঠামোর ড্রাইভারটা মুখে একটু রাগ দেখাবার চেষ্টা করল। তারপরই আমার মাথার ভিতরে অস্বচ্ছ একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছিল। তাকে গাড়ির বনেটের ওপর চিৎপাত করে ফেলে আমি একনাগাড়ে অনেকক্ষণ মেরে গেলাম। নির্জন রাস্তাতেও লোকজন ছুটে আসছিল। প্রথম ভ্যাবাচাকার ভাবটা সামলে নিয়ে সোনামনই প্রথম ছুটে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল দু'হাতে— মানিকসোনা, এই মানিকেসোনা···ওগো···পায়ে পড়ি। আমি সোনামনের কান্নার শব্দও শুনতে পেলাম।

কলকাতার লোকেরা এমনিতেই ট্যাক্সিওয়ালাদের পছন্দ করে না। তার ওপর আমার সঙ্গে সুন্দর একটি মেয়ে রয়েছে। কাজেই ট্যাক্সিওয়ালাকেই আরো কিছু মারমুখো লোকের ভিড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে আমি সোনামনকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। অভ্যাসমতোই আমার স্বয়ংক্রিয় হাত সিগারেট ধরিয়ে নিল। অনেককাল আমি কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে যাইনি। আমার রক্ত ঠাণ্ডা। তবু কি করে যে ব্যাপারটা হয়ে গেল। আমার ছেলেবেলায় শেখা ঘুষি মারার কৌশল আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেককাল আর আমার দুই হাত মারধরে ব্যবহৃত হয় নি।

চুপচাপ অনেকটা হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ সোনামন তখনো তার কিছুটা ধরা গলায় বলল—তুমি যে এমন রাগতে পারো জানতুম না।

লজ্জা পেলাম। গম্ভীর মুখে শুধু বললাম—হুঁ।

সোনামন হঠাৎ বলল— তুমি অত সিগারেট খাও বলেই নার্ভ অত ইরিটেটেড হয়।

অবাক গলায় বললাম— দূর !

সে মাথা নাড়ল—ঠিকই বলছি। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে তুমি যখন সিগারেট কিনতে গেলে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে, তখন আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলেছিলাম যেন সে তোমার কথা না শোনে, যেন একটু ঘুরে ঘুরে যায়। আমি মফস্বলের মেয়ে, ট্যাক্সিতে চড়ে কলকাতা দেখতে আমার ভাল লাগে।

দাঁড়িয়ে পড়ে আমি বললাম—সত্যি বলছো ?

—সত্যি। সে মাথা নাড়ল—কে জানত তুমি রেগে গিয়ে ঐ কাণ্ড করে বসবে মানিকসোনা। আমি তোমাকে বলবার সময়ই পেলাম না। তার আগেই তুমি মারতে শুরু করেছো। মাগো! ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল !

অনেকক্ষণ চুপ করে হাঁটতে হাঁটতে আমি শুধু বললাম— ট্যাক্সির ভাড়াটা দেওয়া হল না।

এ কথা ঠিক যে, উত্তেজনা বেশি হলে আমার ব্যথা বাড়ে। গলা বুক জুড়ে বিষাক্ত টক জল কল্‌কল্‌ করতে থাকে। কোনো কিছুতেই তখন আর স্বস্তি পাওয়া যায় না। ঐ উত্তেজনার পর সেই বিকেলে আমার ব্যথা বাড়তে লাগল। যখন সুইন-হো স্ট্রীটে আমার ছোট্ট একটেরে ঘরটার তালা খুলছি তখনো আমার মনে হচ্ছে একটু বমি হয়ে গেলে স্বস্তি পাবো। সঙ্গে সোনামন না থাকলে বাথরুমে গিয়ে আমি তাই করতুম। কিন্তু পাছে তার কাছে আমার অসুখ ধরা পড়ে যায়, আর সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে আমি সামান্য

কষ্টে আমার যন্ত্রণা চেপে রাখলাম। কিন্তু যে ভালবাসে তার কাছে গোপন করা বড় শক্ত। আমাকে ঘিরে সোনামনের সমস্ত অনুভূতিগুলি বড় সচেতন। অনেক সময় সোনামন ঠিকঠাক বলে দেয় আমি কি ভাবছি। কিংবা আমার মন-মেজাজ কখন কেমন থাকে বা থাকতে পারে তাও মাত্র আট ন মাসের পরিচয়ে সে বুঝে গেছে ! নির্জন রাস্তা তোমার ভাল লাগে, না গো ? ওঃ, তোমার হাই উঠছে, একটু চা খাবে, না ? অনেকক্ষণ খাওনি। তুমি খোলা জায়গায় প্রায়ই আমার মুখ আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করো, যাতে কেউ না আমার মুখ দেখতে পায়, তাই না, বলো ! ইস্ কী বোকা ! সোনামন এরকম অজস্র বলে যায়। ধরা পড়ে গিয়ে আমি আর লজ্জা পাই না। তুব আমি বহুদিন আমার ব্যথাটার কথা গোপন রাখতে পেরেছিলাম। সেদিন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমি প্রবল ব্যথাটাকে কষ্টে চেপে রাখছিলাম। আমার ঘরে যখন সোনামন আসে তখন আমি দরজা দুহাট খোলা রাখি, মাঝখানে একটা টেবিল, তার দুধারে বসি দুজনে যাতে খারাপ কেউ না ভাবে। সেরকম ভাবেই বসেছিলাম দুজনে। কথা হচ্ছিল। আমার ব্যথাটার চরিত্র এই যে, শরীর কুঁজো করে কুঁকড়ে রাখলে সামান্য স্বস্তি লাগে। সাধারণতঃ আমি সোজা এবং সহজভাবে বসি। সেদিন আমার শরীর দুবার কি তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে কুঁকড়ে গেল। ভেবেছিলাম অত সমান্য অস্বাভাবিকতা ও লক্ষ্য করবে না। কিন্তু তিনবারের বার ও কথা থামিয়ে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি হাসছিলাম। ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— তোমার শরীর ভাল নেই।

প্রশ্ন নয়, ঘোষণা।

শরীর সহজ করে নিয়ে হেসে বলি— কোথায় কি ! শরীর ঠিক আছে।

ও মাথা নাড়ল— বাজে বোকো না। তোমার ব্যাপারে আমি বোকা নই। সব বুঝি।

—কি বোঝো।

— তোমার একটা কিছু যন্ত্রণা হচ্ছে।

—কই !

— হচ্ছে, আমি জানি। তোমার মুখ আবার সাদা দেখাচ্ছে। তুমি লুকোচ্ছ।

হাসলাম— বেশ! কিন্তু বলো তো কোথায় যন্ত্রণা ?

ও একটু থমকে গেল। দাঁতে সামান্য ঠোঁট চেপে রেখে বলল— বলব ?

মাথা নাড়লাম বলো।

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ওর চোখে আমার এলানো শরীরের সব ভঙ্গী খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে ও আমার পেট দেখিয়ে দিল—ঐখানে।

— না। আমি মাথা নাড়লাম— ঠিক পেটে নয়, তবে কাছাকাছি। আন্দাজ করে বলো।

কিন্তু এই লুকোচুরির খেলা খেলল না সোনামন। আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল— কোথায় ব্যথা জানবার দরকার নেই। এখন চলো তো !

— কোথায় ?

— ডাক্তারের কাছে।

বহুকাল, প্রায় সেই ছেলেবেলার পর থেকেই কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় নি। বড় লজ্জা করছিল। কিন্তু সোনামন শুনল না, জোর করে নিয়ে গিয়ে প্রথম যে ডাক্তারখানা পাওয়া গেল সেখানেই এক বুড়োসুড়ো ডাক্তারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে। কানে

কানে শুধু বলে দিল— দেখো, ডাক্তারকে আবার বোলো না যেন, আমার ব্যথাটা কোথায় বলুন তো !

রোগা একটা হাড় জিরজিরে ছেলে বুড়ো ডাক্তারের সামনে মা কালীর মতো জিব বের করে দাঁড়িয়েছিল। তার দিক থেকে একবার আড়চোখ তুলে ডাক্তার আমাকে প্রশ্ন করলেন —কী ?

সোনামনকে খ্যাপানোর জন্যেই আমি ভেবেচিন্তে ধীরে সুস্থে কেটে কেটে বললাম— আজ আমি একটা ট্যাক্সির ভাড়া দিইনি ডাক্তারবাবু। তার ওপর ট্যাক্সিওয়ালাকে আমি খুব মেরেও ছিলাম।

ডাক্তার হাঁ করে তাকালেন। পিঠে সোনামনের একটা চিমটি টের পেলাম। ধীরে সুস্থে আমি ডান হাতটা এগিয়ে দিলাম ডাক্তারের সামনে, বললাম — দেখুন ডাক্তারবাবু, ট্যাক্সিওয়ালাটার দাঁতে লেগে আঙুলটা অনেকখানি কেটে গেছে। মানুষের দাঁত বড় বিষাক্ত। এর জন্যে একটা ওষুধ দিন।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে তখন সোনামন লালচে লাজুক মুখে এগিয়ে এল— না ডাক্তারবাবু, ওর কথা শুনবেন না··· ইত্যাদি।

দুটি পাগল প্রেমিক প্রেমিকার পাল্লায় পড়ে আসল ব্যাপারটা বুঝতে ডাক্তারবাবুর অনেকটা সময় এবং ধৈর্য গেল। তারপরও ব্যাপারটা চট্ করে মিটল না । ডাক্তার অনেক কিছু পরীক্ষা করতে চাইলেন। সোনামনের পাল্লায় পড়ে দু'চার দিন ধরে সেই সব ক্লান্তিকর পরীক্ষা আমাকে দিতে হচ্ছিল। কিন্তু সারাক্ষণ আমার মন অন্য কথা বলছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, এসব কিছুই নয় ; আসলে সারাজীবন ধরে আমি যে কিছু কিছু অন্যায় করেছি এ সবই তার প্রতিক্রিয়া। সবচেয়ে কাছাকাছি কারণটা হচ্ছে ট্যাক্সির ভাড়া না দেওয়া এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে ঐ মার। অবশেষে রোগ ধরা— পড়ল হাইপার অ্যাসিডিটি। গালভরা চমৎকার নামটি শুনে আমি খুশী হলাম, সোনামন হল না।

ডাক্তার আমার ব্যাপারে তাকে কিছু কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। পাড়ার একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে আমি মাঝে মাঝে চা খেতাম। সেইখানে এক বিকালে দোকানভর্তি লোকের সামনে সোনামন দোকানদারকে বোঝাল আমার কী বিশ্রী একটা অসুখ হয়েছে। আর চা কত খারাপ ! এর পর থেকে আমি চা চাইলে সে যেন আমাকে এক কাপ করে দুধ দেয়। দোকানদারকে কথা দিতে হল।

তারপর চলল গয়লার খোঁজ যে রোজ সকালবেলায় আমার ঘরের সামনে গরু নিয়ে এসে দুধ দুইয়ে দিয়ে যাবে। আমি আপত্তি করলাম — রোজ সকালে উঠে আমি গরুর মুখ দেখতে পারবো না। কিন্তু সোনামন শুনল না।

যে হোটেলটায় আমি খেতাম সেখানে গিয়েও সোনামন আমার খাবারে ঝাল মসলার ওপর একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে এল। আর আমার ঘরের টেবিলটা ভরে উঠল বিস্কুটের টিন আর ওষুধের বাক্সে। আর সেই থেকেই আমি আমার সিগারেট হাত-ছাড়া হয়ে সোনামনের হাতব্যাগে ঢুকে গেল। বিয়ের একমাস আগে থেকেই ।

বহুদিন হল, প্রায় চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকেই আমি বাড়ি আর মা-বাবাকে ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনো পড়ার জন্য, কখনো চাকরির জন্য। নিঃসঙ্গ জীবন আমার একরকম প্রিয় ছিল ! সেইখানেই পড়ল ডাকাত। সোনামন বিকেলে ফিরে যাওয়ার সময়ে রোজ দিব্যি দিয়ে যেতো—রাত্রে যেন দুটোর বেশি সিগারেট না খাই। ও চলে গেলে

দীর্ঘ অপরাহ্ন আর রাত–জোড়া নিঃসঙ্গতায় সিগারেট ছাড়া তাই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠত! তবু খেতাম না। ওর দিব্যি মনে পড়ত। একটু হেসে আমি আমার প্রিয় সিগারেটে আগুন না জ্বেলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম।

আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে যেতে লাগল। দশ পনেরো দিনের মধ্যেই আর ব্যথার চিহ্ন ছিল না। টক জলের স্বাদ মুছে গেল বুক আর জিব থেকে। চেহারা ফিরল একটু। আর সোনামনের মুখে বাচ্চা লুডো–খেলুড়ীর ছক্কাফেলার মতো ছেলেমানুষী হাসি ফুটে উঠল। তবু মাঝে মাঝে আমার দুর্বোধ্যভাবে মনে হত আমার অসুখের কারণ কেবলমাত্র সিগারেট কিংবা অনিয়ম নয়। কেননা অনিয়ম এবং সিগারেটেরও আবার কারণ রয়েছে। এই রকম অনুসন্ধান করে যেতে থাকলে হয়ত দেখা যাবে আমার প্রস্তরীভূত মূল অন্যায়গুলিকে। সেই ট্যাক্সির ব্যাপারটা আমার প্রায়ই খুব মনে পড়ত। সোনামনকে আমি দু একবার বলতে গিয়েও সামলে গেছি। কেননা ও হয়ত ব্যাপারটায় নিজের দোষ মনে করে দুঃখ পাবে।

বিয়ের পর দুমাস কেটে গেছে। আমার অসুখ নেই। নিঃসঙ্গতা নেই। সোনামন যত্ন করে রেঁধে দেয় মসলা আর ঝাল ছাড়া খাবার। কম সিগারেট। আমার সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ। আর আমাকে নিজের কাছ থেকে পালাতে হয় না বন্ধুদের বিকারগ্রস্ত ভিড়ে কিংবা আড্ডায়। খিদে মেটাবার আলসেমীতে যখন তখন চায়ের কাপ টেনে বসতে হয় না। আমি সুন্দরভাবে বেঁচে আছি। জানি, অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে কখন সোনামনের গভীর উষ্ণ অন্ধকারে চলে গেছে আমার বীজ। ঐ বৃক্ষ থেকে পাকা ফলের মতো বোঁটা ছিঁড়ে শীগগীরই একদিন নেমে আসবে আমার প্রিয় আত্মজরা। আমি জানি। আমি তা জানি। তবু আজ রাত দুটোয় আমি সোনামনকে ঘুমন্ত একা বিছানায় রেখে চুরি–কারা সিগারেট জ্বেলে এসে জানলায় দাঁড়ালাম। হায় ঈশ্বর ! আমি কিভাবে বলব ! সোনামনকে আমি কিভাবে বলব !

ট্যাক্সিওয়ালাটা জানে যে, একটা রাস্তায় দুর্ঘটনার জন্য তার ফাঁসী হবে না। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি তার ট্যাক্সির নম্বর মনে রেখেছি। কিন্তু আমি জানি তাতে লাভ নেই। আমি তাকে আর ছুঁতেও পারি না।

পরশুদিনই আমি তাকে আর একবার দেখলাম। এক পলকের জন্য। সুইন–হো স্ট্রীটের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন যে ছোট্ট বাসাটায় আছি তা বাস রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। একটু নির্জন চওড়া রাস্তা। বড়লোকদের পাড়া। বিকেলে আমি ফিরছিলাম। সারা মন সোনামনের নাম ধরে ডাকছিল। মনে পড়ছিল দরজা খুলে দিয়ে সোনামন কেমন লঘু পায়ে আমার আক্রমণ থেকে সরে দাঁড়াবে। চলে যাবে ছোট্ট ফ্ল্যাটটার কোণে কোণে। অনেকক্ষণের সেই ক্লান্তিহীন লুটোপাটি। সে সময়ে সোনামন তার ঘন শ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে বলবে—মোটেই তিনটে না মশাই, তুমি আজ পাঁচটা সিগারেট খেয়েছো সারাদিন। ভুরভুর করছে গন্ধ। ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনে ফুটপাথ থেকে পা বাড়িয়েছি রাস্তা পার হওয়ার জন্য। অভ্যাসমতো ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। মোড় থেকে ধীরে ধীরে আসছে একটা ট্যাক্সি। ওটা আবার অনেক আগেই আমি পেরিয়ে যাবো মনে করে যখন আমি রাস্তার মাঝামাঝি তখনই হঠাৎ মোটর ইঞ্জিনের তীব্র শব্দ হয়েছিল। হর্ন বাজে নি। হতচকিত আমি দেখলাম। পাগলাটে ক্ষ্যাপা ট্যাক্সিটা বাঘের মতো লাফিয়ে চলে এল। বৃথাই আমি একটি হাত তুলে আমার অসহায়তা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কেননা ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি সে কী চায়। সময় ছিল না। একদম সময় ছিল না। শুধু

শেষ চেষ্টায় আমি খুব জোরে শূন্যে লাফিয়ে উঠলাম! ট্যাক্সির নিচু বনেটটায় আমার পায়ের জুতোর ঠক্ করে শব্দ হল। আমাকে পাকিয়ে ছুঁড়ে একধারে ফেলে রেখে গাড়িটা তার তীব্র গতি বজায় রেখে বেরিয়ে গেল। খুব সামান্য এক পলকেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্য আমি ড্রাইভারের রুক্ষ মুখটা দেখতে পেলাম, অস্বচ্ছভাবে শুনতে পেলাম তার চাপাগলার গালাগাল—শালা···

উঠে দাঁড়াবার পরও অনেকক্ষণ আমার সামনে শূন্য রাস্তাটাকে বড় বেশী শূন্য বলে মনে হয়েছিল। চারপাশ খুব নির্জন এবং শীতল—যেন কিছুই ঘটে নি। পুরোনো অভ্যাসমতো আমি সিগারেটের প্যাকেটের জন্য পকেটে হাত বাড়ালাম। সোনামনের মুখ মনে পড়ল। আমি যাতে নিরাপদে থাকি সেইজন্যেই আমার সিগারেট কেড়ে নিয়েছে সোনামন। সে চায় আমি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি, কোনো অসুখে, সামান্য অসুখও যেন না থাকে তার মানিকসোনার।

রাত দুটোর নির্জন রাস্তার দিকে চেয়ে আমার সেই একদিনের চেনা ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—ভাই ট্যাক্সিওয়ালা, তুমি কি জানো আমার সোনামন চায় যে, আমি আরো দীর্ঘকাল নিরাপদে বেঁচে থাকি ?

তবু আমি জানি এই ঘরে আমার সোনামনের সতর্ক যত্নের বাইরে খোলা রাস্তায় আমাকে যেতে হবে। কলকাতার রাস্তার গলিতে হাঁটাপথে কোথাও না কোথাও পছন্দমত জায়গায় সে আমাকে পেয়ে যাবে। হয়তো সারাদিন ধরে তার ট্যাক্সি ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করে থাকবে গলির মোড়ে, অফিসের পাশেই কোনো চোরা গলিতে, হয়তো বা সে আমার পিছু নিয়ে ফিরবে দীর্ঘপথ। তারপর একদিন দেখা হবে। সে তো জানেও না কে আমার সোনামন, কিংবা কিরকম আমাদের ভালবাসা ! জানেও না সোনামনের শরীর জুড়ে আমাদের সন্তান আসবে শীগগীরই একদিন! সে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে আমাকে জানে যে, আমি অন্যায়কারী, সে জানে আমি তাকে একদিন মেরেছিলাম। তাই বহু খুঁজে খুঁজে সে আমার চলাফেরার পথ বের করেছে। এখন কেবল সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

পরিপূর্ণ শান্ত আমার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে আমার চুরি-করা প্রিয় স্বাদু সিগারেট ধরিয়ে সামান্য অন্যমনে অনিশ্চয়ভাবে আমি মৃত্যুর করা ভাবছিলাম। তিনমাস আগে সেরে-যাওয়া বুক ও পেটের মাঝখানের সেই ব্যথাটা আস্তে আস্তে ফুলের কলির মতো ফুটে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

গঞ্জের মানুষ

রাজা ফকিরচাঁদরে ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরিষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকির- চাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হীরে-জহরত সব ঐ ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেল লাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছগাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘসটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধ্যের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনো ফেরেনি দেখে চৌপথিতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ গাড়িতেও আসেনি। আরো খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তা-ভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাত নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় পায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথি থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচো মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা, সিঁথের সিদুঁর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জে সবাই নদীয়ার বউকে ভয় পায়। নদীয়া নিজেরও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোকটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না। চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুঝে ভয়ে ভয়ে বলে— কে নদীয়া নাকি ?

— হয়। নদীয়া উত্তর দিল।

— কোন বাগে যাচ্ছো?

— বাজারের দিকেই।

— চলো, এক সঙ্গে যাই।

— চলো।

দু'জনে এক সঙ্গে হাঁটে। ফেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন্ শব্দ হচ্ছে ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষ মানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ঐ সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনওলা হাওয়াই

চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ঐ চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু'দুটো মদ্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভান্ডারে দু'বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ঐ একটাই মিষ্টির দোকান। আরো কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা, জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

—আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছো কখনো মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে।

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালী হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু'চারটে হিন্দী কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল— নদীয়া ভাই, আউরাত তোমার কোথায় ? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মত্।

—তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগনার মজা দেখছো।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল–এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কি, তোমার তো একজোড়া ভাল জুতিই নেই। ঐরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়।

—রাখো রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে— শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহলাদ আসে মনে। এত আহলাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে–কানাচে শোভারাম কুকুর–বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনো বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত–প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা–পুলিসকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সব সময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মসলাপাতি, মনোহারি জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভাল লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু'পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এ সব পোশায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কী বা ছিল। শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারী ঝাঁঝ তাদের–হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে। শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো

আছেই, বোতলের নেশা ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনো সহায়। ছেলেশ-বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁতকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটানো দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছরখানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ'মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে-তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছা পওরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে না হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায়-ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশাভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড় সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুর ঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিসেও খোঁজখবর করছে। বড় অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশাভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, কুব ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড় সহজ কাজ নয়! সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝে-সমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূত-প্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানি মন্ত্র। মদনা যে আজ বড় চোর হয়েছে সেও মাগনা নয়। যে দিকেই বড় হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি-মিনতিতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারামও বাপকে দূর-দূর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটেকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু'পাঁচ টাকা ঐ বাপ কি ছেলেই ছুঁড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম! চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুর ঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মসলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল—কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু'চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড় ভাল। সারাদিন বসে কী যেন ভাবে। লোকে বলে, গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ঐ শ্রীপতি মাস্টারই তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে

সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্যু খেলারামকে রোজ সন্ধ্যেবেলা দু'ঘন্টা পড়িয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ঐ দু'ঘন্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

—রাম রাম মাস্টারজী। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার খুব গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারগ না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি-ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল— কোন হ্যায় আপ ?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দী বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে এসে সে বড় বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দীতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলাদেশে থেকে আর বাঙালীর সঙ্গে কারবার করে করে হিন্দী-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দী শেখে।

শ্রীপতির হিন্দী শুনে ভয় পেয়ে শোভারাম বলে— আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজী। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি ?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমন কি সে যে এত ভাল হিন্দী জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দী বলবে। আর যা সব জ্ঞান আছে তার, সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারি করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দু'বার ঠেক খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড় ইচ্ছে যে খেলারাম বি-কম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বি-কম হওয়া যায় ?

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে— একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায় ?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে— কোথায় আর যাবে, বাকি-বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম, ততক্ষণ বসে উঠে যাবো।

—সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে— খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজী ?

শ্রীপতি বলে— কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে —আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে। বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। খেলারামেরও না হোক বাইশ-চব্বিশ হবে!

এত বয়স পর্যন্ত এই গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপড় শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে এই গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। ইঁটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তাছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভাল করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরির চাপানের মতো আর কী আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারি বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো— ঝা চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি না দেখি না ভাব করে ব্যাপারির জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড় মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্লাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতছিপ্পু করে দু' প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেই সঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখি পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সবজি বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সবজিওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু–কপি–বেগুন সাজিয়ে। ব্যবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যবসা করা দু' চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতো জোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও–প্রান্তে দোকান, এখনো বেশ খানিকটা দূর। নদীয়া ডানপায়ের চটিটা তুলে সবজিওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলি দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে, বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। নাঃ গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল ! চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারী দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে ?

চামার সীতারামের দোকানটা সবজি বাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভাল। একধারে লোহার আড়ত, অন্য ধারে ভূষি মালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নিচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচির দোকান ত্রিশ–চল্লিশ

বছরের পুরোনো। ছোট চৌখুপিটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয়-বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনো গর্তের ভিতর থেকে শুকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খস্‌খস্ করে দু'চারবার ঘসে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে— দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কিনা।

নদীয়াকুমার ভাল খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে— এ তো ভিখমাঙ্গাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা ?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে— বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে— ফুটো হবে কোথায় ? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনোদিন। খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল — দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোর টান দিয়ে বলল— দেখবেন নদীয়াবাবু, জুতো মাথায়-মুখে লেগে যাবে! অত ঝুঁকবেন না।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এনে ভুস্‌ভুসে রবার ফুটো করতে করতে বলে— বাবুলোকেরা মাথা নিচু করতে জানে না তো, তাই ওই সব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

— এঃ, ব্যাটা ফিলজফার! বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড় কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আকজাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবিধুতি পায়ে চপ্পল, বাঁ হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষির চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদীয়া। মুখটা অন্য ধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভাল দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে

উঠে বসে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে— ওঠ, ওঠ রে নদীয়া! নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি পড়ে আছে। নদীয়ার ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল— খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো ? তা ছাড়া বড় কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই! পড়শিরা ডাক্তার-কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিওপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে ? সেই বড় কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সব সময় কাছে কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ঐ যে খড়-কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনো ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না-হক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু। মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল— শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের টিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে বলল— তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নির্ব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি। রক্তবমি হয়ে মরবি যে।

ফস করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে— ছেলেপুলে নেই তো কী! হবে।

—হবে ? ভারী অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

—আলবাত হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়। তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে

পারে নদীয়া। ঐ যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম কখনো উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ঐ শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনোদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দল-বল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারী দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভাল করে শেষও হয়নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কী গো, নদীয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে ? এ পরে বেড়াও নাকি ? খবর্দার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ঐ কুকুরে-খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে ?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদীয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারী জুতো। চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা। রঙটাও ভাল। নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে— নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া ?

শোভারাম বিস্তর রঙ-ঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে! শোভারাম ভেবে-চিন্তেই বলে। কারণ সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিসনি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি ? নাকি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোখা চটে লাভ কী? ভালমানুষের মতো বলে— না গো নদীয়াদা, সে সব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে। তো বৈরাগী মণ্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোটো কিনে ফেলেছি। বেদম টাইট হচ্ছে। দেখ তো, তোমার পায়ে লাগে কিনা—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কী। ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোশায়।

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা এরকম রয়ে গেলে নদীয়াদা। তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল। নাও তো, পরে দেখ। পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেবো। ত্রিশ টাকায় কেনা, তা সে কত টাকা জলে যায়। পরে দেখ।

নদীয়া এবার একটু নড়ে। বলে —কত টাকা বললি ?

শোভারাম হাসে, বলে-ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেও না শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্প-শুর মতোই। কিন্তু ঠিক পাম্পশু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখল নদীয়া! আরে বা! দিব্যি ফিট করছে তো। এই শীতে পায়ে বড় কষ্ট। চামড়া ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায়, অসমান জমিতে পা পড়লে

হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদীয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দু'খানা ঘরবন্দী হয়ে গেল। ধুলোময়লা পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে— বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটোলোকি পায়ে কি আর ওসব পোশায় ? তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেবো। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বললে — টায়ারের চটি কি সস্তা নাকিরে ? হলে বরং আমিও একজোড়া—

—আরে না. না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে— সে বড় শক্ত জিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোস্কা পড়ে কেলেঙ্কারি হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলি-মজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ-বিশ টাকা দিয়ে দিও, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে— ও বাবা, বলিস কি সব্বোনেশে কথা, ডাকাত কোথাকার! দশ বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ। আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে। তারপর খুব ধীরে বলে— তোমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠাণ্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কী রকম ধারা রুগী তুমি ? দুনিয়ার কত কী আরামের জিনিস চমকাচ্ছে— তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছো।

নদীয়া না-না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড় বাহার। আরামও কম কী! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে। নিজে রোজগার করতে নেমে আর বাবুগিরি হয়নি। বলল— দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে।

—দশ কী বলছ ? বিশ টাকা, না হয় পনেরোই দিও। সেও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোটো হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনো বাজার ঘুরলে বিশ-পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

—বারো টাকা দেব। ঐ শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা-হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো ? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা।

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাইমাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকোনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কিনা কে জানে। নদীয়ার কোনো কাজই তো

সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী, নদীয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতোজোড়া দেখে নেয়। মিটমিটিয়ে একটু হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা··· ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দু'জনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ-তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কী হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায়, তেমনি মাস্টারজীকে ভয় পায় খেলা। মাস্টারজী সটাং ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে, কষাকষ হিন্দী বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারী বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বল তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়! ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারের মধ্যে শীতের কুয়াশায় নেমে গেল। তার ভিতরে কত বিদ্যা গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে আসতেই শুনল, দাদু ভেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে— কোথায় সারাটা দিন লেগেছিলি চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়। পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে বসে থেকে চলে গেল! জুতো চোরের ব্যাটা।

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা। একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছো—বাজার পেরোবার সময়ে। তখনো কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপি জ্বালিয়ে। এই সব লোকেরা শেলি-কীটস পড়েনি, শেক্সপিয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচেবর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে ? সত্য বটে, একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়! যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন

দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ঐ ম্লান একটু কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্না কিংবা ফটিকচাঁদের টিবিতে একা শিরিষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনো মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বইয়ের জগতের তালেব লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও পায়। তবু কি একটা খাঁকতি থেকেই যাচ্ছে। সে কি ঐ উপলব্ধি বা দর্শনের ?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্নামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পর্দায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে করতে কাছে এসে পড়ল। সব কটা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম মাস্টারজী, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নিচু নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওলা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর টিবি—

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজী ? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতেরো হয়ে গেছি! ভাল লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়ই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুঁথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজী। ফটিকচাঁদের টিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফটিকচাঁদের টিবিতে খোঁড়াখুড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হীরে-জহরৎ একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় টিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ-ব্যাঙ আর ইঁট-পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে টিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল। নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসই করে নিয়েছে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধ হয় নদীয়াকে গালমন্দ করছিল। করবেই! সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশার জ্যোৎস্নায় যেন দুধে-মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোয় শীত সেঁধোচ্ছে। বাবাকেলে তুষের চাদরটায় মাথামুখ ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথির কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফটিকচাঁদের ঢিবিতে কারা যেন গোপনে কী সব করছে। দু'চারটে ছায়া ছায়া লোকজন দেখা গেল। নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভাল নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে নতুন জুতো জোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুক ফাক করে সুখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিন দশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো-এর মধ্যে যদি খোঁজাখবর হয় তো গেল তেরটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলেছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো দরকার। ভেলুরাম বলেছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায় ?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত? তার বাড়িতে আবার মেয়েছেলে কে আসবে ?

নদীয়া বলল—রাম রাম, কে ?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে —কে আমি ?

—আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, উর্ধ্ব মুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষ মানুষের মতো চুলওলা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

আঁ, আঁ, করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী।

— তোমার এই সাজ ? ভারী অবাক হয় নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে—কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনীকে পছন্দ করে এসেছো, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থাপনা করবে —তাতে বুঝি ছাই দিলাম! ঝাঁটা মারি—

এই সব বলতে বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কি টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল। নতুন জুতো। বউ।

গহিন রাত্রে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুঁড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদীয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এই রকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে— কাঁদো কেন ? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড় দুঃখী, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাবো কোথায় ? কত লম্বা চুল আমার। তুমি কি এখন আর আমাকে ভালবাসবে চুল ছাড়া।

—দূর মাগী! নদীয়া আদর করে বলে—চুলে কী যায় আসে।

ভোর রাত পর্যন্ত সাত মাতালে টিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসী বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরো। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী।

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাতাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প অল্প মাটি সরে আর বস্তুটা বেরোয়। কী এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে ঘড়া বা কলসী নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস। ফটিকচাঁদের বসতবাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্য রকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর, কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়ে ছিল এইখানে। জংধরা লোহা, হলদে রঙ ধরেছে।

কেউ কোন কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম।

খেলা দুলে দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা। ব্যাটা বোধ হয় ভদ্রলোক হবে একটা।

ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

দেখা হবে

নক্সীকাঁথার মত বিচিত্র এক পৃথিবী ছিল আমাদের শৈশবে। এখনও পায়ের তলায় পৃথিবীর মাটি, চারিদিকে গাছপালা, মাথার উপর আকাশ। বুক ভরে শ্বাস টেনে দেখি। না, শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা বাগান থেকে যে রহস্যময় বন্য গন্ধটি পাওয়া যেতো তা আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাঁওতাল মালী বিকেলের দিকে পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালত। সেই গন্ধ কতবার আমাকে ভিন্ন এক জন্মের স্মৃতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আর মনে আছে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ। সে গন্ধ ঘুমের ভেতরেও টের পেতাম, মা অনেক রাতে বিছানায় এলো। মার দিকে পাশ ফিরে শুতাম ঠিক। তখন নতুন ক্লাশে উঠে নতুন বই পেতাম ফি বছর। কি সুঘ্রাণ ছিল সেই নতুন বইয়ের পাতায়। মনে পড়ে বর্ষায় কদম ফুল কুড়িয়ে এনে বল খেলা। হাতে–পায়ে কদমের রেণু লেগে থাকত বুঝি। কি ছিল! কি থাকে মানুষের শৈশবে! বিকেলের আলো মরে এলো যেই অমনি পৃথিবীটা চলে যেত ভূতেদের হাতে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া ছিল ভারি শক্ত। বিশাল বাড়িতে কয়েকটি প্রাণী আমরা গায় গায়ে ঘেঁষে থাকতাম। ভোরের আলোটি ফুটতে না ফুটতে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটতাম বাইরে। বাইরেটাই ছিল বিস্ময়ের। সূর্য উঠছে, আকাশটা নীল, গাছপালা সবুজ। সব ঠিক আগের দিনের মতই। তবু অবাক হয়ে দেখতাম, মনে হতো, গতকাল ঠিক এরকম দেখিনি তো। সেই আনন্দিত ছেলেবেলায় একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল। আমার ছোটকাকা মৃত্যু শয্যায়। মাত্র দেড় বছর আগে কাকীমা এসেছেন ঘরে। একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে। সে তখন হাত–পা নেড়ে উপুর হয়, কত আহ্লাদের শব্দ করে। তবু বৌ মেয়ে রেখে ছোটকাকার মরণ ঘনিয়ে এলো। বিকেলে শ্বাস উঠে গেছে। দাদু তখন বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। বাঁ হাতে ধরা তামাকের নল, কল্কেতে আগুন নিভে গেছে কখন। সন্ধ্যের পর জ্যোৎস্না উঠেছে সেদিন। দাদু সেই জ্যোৎস্নায় পা মেলে বসে আছেন। ভিতর বাড়িতে কান্নার শব্দ উঠেছে। বাবা আর জ্যাঠামশাইরা এসে দাদুকে ডাকলেন।

—আসুন, প্রিয়নাথকে একবার দেখবেন না ?

দাদু খড়মের শব্দ তুলে ভিতর বাড়িতে এলেন। তার মুখখানা একটু ভার দেখাচ্ছিল, আর কিছু নয়। ছোটকাকা তখন বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। কাকে যেন খুঁজছেন। কী যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। বার বার বলছেন — তোমরা সব চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো, আমাকে কিছু বলো।

জ্যাঠামশাই নিচু হয়ে বললেন— কী শুনতে চাও প্রিয়নাথ ?

ছোটকাকা ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি কি জানি! একটা ভাল কথা, একটা সুন্দর কথা কিছু আমাকে বলো, আমার কষ্ট ভুলিয়ে দাও। আমি কেন এই বয়সে সবাইকে

ছেড়ে যাচ্ছি—আমার মেয়ে রইল, বৌ রইল—আমার এই কষ্টের সময় কেউ কোন সুখের কথা বলতে পারো না ?

বড় কঠিন সেই পরীক্ষা। কেউ কিছু বলতে পারে না। সবাই কেবল মরোণোন্মুখ মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কথা খুঁজে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকের ঠোঁট কাঁপে।

একজন অতি কষ্টে বললো—তুমি ভালো হয়ে যাবে প্রিয়নাথ। শুনে ছোটকাকা ধমকে বললেন—যাও যাও— ।

আর একজন বললো— তোমার মেয়ে বৌকে আমরা দেখবো, ভয় নেই।

শুনে ছোটকাকা মুখ বিকৃত করে বললেন— আঃ, তা তো জানিই, অন্য কিছু বলো।

কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সেই সময়ে দাদু ঘরে এলেন। স্বাভাবিক ধীর পায়ে এসে বসলেন ছোটকাকার বিছানার পাশে। ছোটকাকা মুখ ফিরিয়ে তাকে বললেন—বাবা সারাজীবন আপনি কোনো ভাল কথা বলেন নি, কেবল শাসন করেছেন। এবার বলুন।

সবাই নিস্তব্ধ! সেই নিস্তব্ধতায় একটা পাহাড় প্রমাণ ঢেউ অদৃশ্য থেকে এগিয়ে আসছে। ছোটকাকাকে জীবনের তীরভূমি থেকে অথৈ অন্ধকারের এক সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে বলে ঢেউটা আসছে, আসছে। আর সময় নেই। ছোটকাকার জিভটা এলিয়ে পড়েছে, বার বার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ প্রবল ব্যথায় বিকৃত!

দাদু একটু ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললেন—প্রিয়নাথ, আবার দেখা হবে।

কী ছিল সেই কথায়! কিছুই না। অতিথি অভ্যাগত বিদায় দেওয়ার সময় মানুষ যেমন বলে, তেমনি সাধারণভাবে বলা। তুব সেই কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকার মুখ হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। নক্সীকাঁথার মত বিচিত্র সুন্দর শৈশবের পৃথিবী কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই সুন্দর গন্ধগুলো আর পাই না, তেমন ভোর আর আসে না। মায়ের গায়ের সুঘ্রাণের জন্য প্রাণ আনচান করে। পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। বুড়ো গাছের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে আমার ডালপালা। খসে যাচ্ছে পাতা। মহাকালের অন্তঃস্থলে তৈরি হচ্ছে একটি ঢেউ। একদিন যে এই পৃথিবীর তীরভূমি থেকে আমাকে নিয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে শৈশবের একটি কথা তীরের মতো বিঁধে থরথর করে কাঁপছে আজও। সেই অমোঘ ঢেউটিকে যখনই প্রত্যক্ষ করি, মনে মনে তখনই ঐ কথাটি বুকের মধ্যে কেঁপে উঠে। শৈশবের সব ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শ ফিরিয়ে আনে। মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পেয়ে যেমন ছেলেবেলায় পাশ ফিরতাম তেমনি আবার পৃথিবীর দিকে পাশ ফিরে শুই। মনে হয়, দেখা হবে। আবার আমাদের দেখা হবে!

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উল্টোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধূলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রঙ ঘন নীল। পরনে একটা খাঁকী রঙের ফুলপ্যান্ট— লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগ্‌গে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দু' চারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। যা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দু' হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাথের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবু এখনো চোনা যায় অরুণকে। চেনা যায় ? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রঙ, ভোঁতা নাক, বড় চোখ— এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল— সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ — সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়, এখনো অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধ হয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধ হয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ঐ গাছতলায় বসে আছে। ঐখানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল— এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ঐ চোখে ঘৃণা আক্রোশ, প্রতিশোধ— এই সব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ্য করে

অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজ্‌গিজ্‌ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনো পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনো তাকায় নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি ? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাস মতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট-শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাস মতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ, লতাপাতা, আঁকে। আর আঁকে খোঁপাশুদ্ধ মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই । তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে । সারাদিন।

আজও লম্বা নিম পাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল—স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ঐ এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ঐ সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তে মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন তখন দেখবে। সময় মতো স্নান, খাওয়া, সময় মতো সব কিছু। এই সব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনো কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না । সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধ হয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না কি, করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ঐ বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ্য করছে ও। ভয় করলে কি চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিঙ থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট। পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরুচ্ছাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ঐ ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ঐ একবার। তাও জোর করে। এখন ঐ নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্না ঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে— ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ঐ গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চীৎকার করত, আকাশ-বাতাসকে গাল দিত। চীৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম··টেলিগ্রাম···! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনো ভালোবাসেনি কল্যাণী, সে ভালোবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারে নি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায়। চৌকী দিতে লাগল, চীৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা-জানালা খুলত না।

— চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

— গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল! কিন্তু তার বেশি এগোলো না। চীৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই এখন কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল — ওকে কিছু খেতে দিও। সারাদিন বসে থাকে।

— কেন ?

— দিও। ও তো কোনো ক্ষতি করতো না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দু'বেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায় নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুল কুল করে তার মাথার ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। চোখ বুজে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়!

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেই সব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের জুনিয়ার থেকে। এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানীর দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকণ্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুশায়ার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নাড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর-ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ, জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে। কোনো কোনো দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনো কোনো দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে! দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইঁট, কাঠ, বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রীট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বীমের গায়ে টং টং করে ছুঁড়ে মারছে! ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার! শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ঐ তুচ্ছ শব্দটি—ঘন্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপ। ঘন্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ঐ শব্দ যেন কখনো শোনে নি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে— ছুটি চাই, ছুটি চাই! মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কিসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা —এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়— কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনো পাথর ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

— কোথায় যাবেন ?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে— সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছা করে না। বাড়ি ফেরা— সেই একঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে— সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাবো। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবেত মোড়ে এসে যায়। এবার ? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনো কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো-লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ— তুষারের বুক ব্যথিয়ে উঠে। মনে হয়— কেবইল মনে হয়— কী একটা সাধ তার পূরণ হয় নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবনে।

সে আবার বলে— বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে! আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরোনো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কি একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল! হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল! নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরানো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামী সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরানো বাড়ির তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে— এখনো নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনো এখানে আছে কিনা সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার ?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল — কাকে চাই ?

তুষার হাসল— চিনতে পারছ না ?

নিনি ওপরের দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রঙ মেলে নি। পাঁচ বছরে অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

— আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়— আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছো! বুড়ো হওনি ?

— আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছো কিনা! তোমার স্বামী পুত্র হয় নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল— আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলী আসবাবপত্র। এখনো সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গীটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল — তুমি একটুও বদলাওনি।

— তুমিও।

কিন্তু তুষারের তীব্র ইচ্ছাটা এখনো অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে ? হবো তো ? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামী মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে — এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ঐ যে গোপনতার ভান করে দামী বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত— মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতাময় একটা গৎ গীটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গীটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বীমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি— থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা —

তুষার থামে—কী বলছ ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে— এইখানে বড় ব্যথা —

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—গত বছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায় ?

সময় পেরিয়ে গেল তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনান নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরে ব্যালকনি, উল্টোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাবার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরানো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনো নির্জন সেক্সপিয়ার সরণী, কখনো চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গী রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনো মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে। তার মন বলছে এখানে নয় এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে, ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভূতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা ? সে কী চাকরি করতে করতে ক্লান্ত ? সে কী সংসারের একঘেয়েমী আর পছন্দ করছে না ? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল ?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছো ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে ?

—কোথায় আবার ?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারী বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছো কেন ? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না! আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী —শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি ? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষ করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেকটা রাত হল আরো। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুল গাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়।

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি ?

—কী করে দেবো ? রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন ?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়! বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে ?

তুষার হাসল— তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে, ওর জন্য আমরা কিছু দিই —

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ঐ খানে, ঐ ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না ? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনো মাছির মতো বসে থাকে—দেখ না ? এখনো আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনো তেমনি উজ্জ্বল রঙ। চেয়ে দেখ না অরুণ ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়েতো কোনো গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনো নিয়ম না মারলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছো অরুণ। তোমার মুক্তি নেই ?

ডাল তরকারীতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঝুকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বীমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং টু শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কিসের মুক্তি ? কেমন মুক্তি ? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল ?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে তুষার, চুমু খায় তীব্র আগ্রহে, বিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্য ও পাগল ? কী আছে তোমার মধ্যে ? কী সেই মহামূল্যবান ? আমাকে দিতে পারো তো ?

বৃথা। সবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু আর কিছু নয়।

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক্-ধক করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দু'হাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কিসের শব্দ ওটা ? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে ? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো, তাতে ঘনায়মান অন্ধাকার , উঁচু ক্রেন হ্যামার! অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চলো সমুদ্রে! চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টি ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চার ধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকী রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনো বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নিচে বকুলগাছ, তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট্-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাশুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নিচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে— কী করে ঘুমোও ?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে ?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিঙ শিলঙও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে মনে ঠিক জানে— যাওয়া বৃথা! সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে— নানাঃ। বলেই চমকায়। কীসের না ? কেন না ?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরী ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—নানাঃ স্টে-নোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদেকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে ?

নির্জন শেক্সপীয়ার সরণী ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও ভাই। আরো জোরে···আরো জোরে···

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে ?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে না কল্যাণীকে একবার কাছে থেকে দেখতে ?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাওনা সে কেমন আছে ?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের ঘরে। যাবে অরুণ ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে— আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দু'বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারো জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার— কী বলেন ?

—বলি, ঐরকম মহাপ্রাণ হয়ে উঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন —এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে— ন্‌নাঃ। চমকায়! জলবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড় বৃষ্টি হলে এখনো মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বুকুল গাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনোদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা। কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দেখ কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন্‌ঠিন্ শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছে থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসীদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা। খাকী প্যান্টের রঙ পান্টে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধূলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনো অকৃপণ সুন্দর, সুগন্ধ বকুল ফুলে ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নিচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল—খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দেখ, আমার ঘরদোর। ঐ যে মশারির নিচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দেখ, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দেখ ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ঐ ড্রেসিং টেবিল। এই দেখ, আরো কত কী···

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে ? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বৌ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না?

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়— কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ? থাকো থাকো। থেকে দেখ।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার!

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুল গাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্য লগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে!

উত্তরের ব্যালকনি এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুল গাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনিতে থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুল গাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনো সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়ছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরানো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনো! কে জানে ? মাঝে মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনো দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর, ঐ যে ভালোবাসার জন্য পাগল অরুণ — ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী? বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে! অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দু' জনে দু' জনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানী এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুল বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

হাওয়া—বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কি ভাবে যায় কেউ কি তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড় নয়, দুঃখের ধারণাও নয় বড়। ছোট সুখ, ছোট দুঃখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একুটখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ —এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখ দুঃখের সেই ছোট ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুঠেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন-ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনো তার বিয়ে হয়নি। চুরি-করা দুর্লভ বিকেলে তারা ঐ রকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙীন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়—নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্নতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানী ডাকছে—

—প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা, আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

—মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

মণিকা-কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে!

—দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

—তাহলে কী হবে?

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কি যেন পেয়েছিল!

—দ্রৌপদী।

—আমিও পাবো মণিকাকে।

—পেয়ে তো গেছোই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা তোমাকে বড় সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয়নি, যুদ্ধ করতে হয় নি, মা-বাবা বাধা দেয় নি। কিন্তু এত সহজে কিছু কি পাওয়া ভাল?

মণিকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ভাল নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

—না না তা নয়।

—তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

—তাও নয়। তোমাকে চাই। কিন্তু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল, বলল—তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দু'বছরের জন্য দিল্লীর মাসীর বড়িতে, বি. এ. পরীক্ষাটা না হয় ওখানেই

দেব। নইলে চল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা-টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোল। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে—না, না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ঐ টারগেটের দোকানে চল। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

—ফাটালে কি হবে?

—তোমাকে জয় করা হবে।

—না পারলে?

—জয় করা হবে না?

—তা হলে আমাদের বিয়েও হবে না?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল—না।

—বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সব কিছু সহজে পেতে ভালবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল—মণিকা।

—উঁ।

—ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

—যদি না পার?

—না পারলে—

কথা শেষ করে না সঞ্জয়।

—না পারলে?

— বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোন।

—কি?

—তুমি ইয়ার্কি করছ?

—না।

—সিরিয়াস?

—ভীষণ!

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে,—তুমি ভীষণ জেদী। পুরুষমানুষের জেদ ভাল, কিন্তু যার উপর আমাদের মরণ-বাঁচন, তা নিয়ে তোমার খেলা কেন?

সঞ্জয় কাতর স্বরে বলে, মণিকা, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই তোমার আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছি। বড় হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপারটা বল তো! কোনো রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই ; প্রতিযোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া! আজকের দিনটাই একটু ক্ষণের জন্য এস একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের সম্পর্কের মধ্যে।

মণিকার বড় অভিমান হয়েছিল মনে মনে। সে কী বাজীকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে? সে কি লটারীর পুরস্কার? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর উপর নির্ভর করবে অবশেষে? ছোট্ট একটু দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড় বিষ, বড় জ্বালা। মণিকার চোখভরে জলও কি আসে নি? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছে ছিল গোপনে। বলল—শোন, আমি লটারীর প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালবাসি সে আমার পূজো। আমি কেন নিজেকে অত হাল্‌কা হতে দেব? তুমি চল, ঐ দোকানে যেও না। ও খেলা ভাল নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড় জেদী, ঐ জেদই তাকে পুরুষ করেছে! ও জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়াল। মুখে হাসি নিয়ে বলল—শোন মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

—এ সব নিয়ে খেলা কর না। চলে এস।

—না, প্লীজ, তিনটে চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে করে বলল, কিন্তু মনে রেখ, যদি না পার এ বিয়ে হবে না।

—আমিও তো তাই বলছি!

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কি এতই পল্‌কা! যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে! এ সামান্য খেলায় সারা জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদে-কেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ঐ সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহংকার-অভিমান-জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল—বেশ।

দোকানী বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে একবার মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল—মাঝখানের ঐ হলুদ বেলুনটা। বুঝলে লক্ষ্য কর।

—করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য স্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয়, বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায়, সুন্দর দেহটি। ধারাল মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ঐ পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে! এ কী ছেলেমানুষি!

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃদপিণ্ড। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মতো বুক দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারে নি। হ্যাঁ এবং না —এর ভিতরে, আলো আর অন্ধকারের ভিতরে, সুখ ও দুঃখের ভিতরে টিক্-টিক্-টিক্ করে যাওয়া -আসা করে তার বুকের দেওয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে—আর মাত্র দু'টো চান্স। দেখ, সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার বন্দুক নেয় দোকানীর কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ্য করে, ওর হাত কাঁপছে! বড় মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দু'চোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল, রঙীন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙে-চুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে! প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া-বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেই সঙ্গে যে কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন। দ্রুত দোল খেতে লাগল বুকের দোলকটি, যেন বা খসে পড়ার আগে সে তার শেষ দোলায় দুলছে। এবারও লাগে নি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়ছে ভয়ঙ্কর মুখখানা। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উত্তেজনায়। তার ঠোঁট সাদা। দোকানী আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে—আবার মারুন। ঠিক লাগবে।

—লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভাল মানুষের মতো বলে —আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষ বারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

উ!

—যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে—জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলে নি যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে।

মাণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

—আমরা একসঙ্গে ফিরব না?

—না।

তুমি একা ফিরবে?

—হুঁ।

—আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

—তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল—মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলি নি, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালবাসতাম। আর কখনো কাউকে এত ভালবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে! কোনক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোন।

—কী?

—শেষ চান্সটা থাক্। মের না।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ।

—আমিও।

—তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকী থাক।

—হেরে যাবো মাণিকা? পালাবো?

—তাতে কি? কেউ তো জানবে না।

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি? বন্দুকটা রাখল, একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকালো, চোয়ালের পেশী দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না? কিন্তু তুমি তো জানবে?

—কী জানবো?

—আমি যে পালালাম।

—আমি ভুলে যাবো।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে। —তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে মনে ঠিকই জানবে যে এ লোকটা কাপুরুষ। এ লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয় পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন-ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী আছে তা তো তার জানা ছিল না। রঙীন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে! সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া বন্দুকটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলেছিল — হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম! মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে— তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের? মণিকার প্রতি তবে কি স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন? তাহলে কেন বন্দুকের খেলায় ঐ হেলাফেলা, উদাসীনতা? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টেনে। দু' হাত প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ঐ খেলনা–বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎ–সংসার। সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা। ফাটবে, না কি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবী সূতোয় দুলছে। ছিঁড়বে। এক্ষুণি ছিঁড়বে।

হাওয়া–বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের স্খলিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বাঃ, এই তো পেরেছেন!

তারা দু' জনে কেউই বিশ্বাস করে নি প্রথমে যে বেলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে— মণিকা!

— উঁ!!

— লেগেছে।

— যাঃ।

— সত্যিই। দ্যাখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটা কেমন রঙীন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারিদিকে। অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে— সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগ্বিদিকে। চারধারকে ডাকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে— আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দু' জন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলার হাওয়া–বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনোদিন আটকাতে পারে নি। রাত বিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম ভেঙে উঠে উদ্বেগের গলায় বলত ····ইস্। কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে কাশতে বলে — স্মোকারস্ কাফ। ও কিছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

— আবার সিগারেট ধরালে?

— সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে এ কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

— বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারীতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে— লাগুক না।

— লাগুক না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শীগ্‌গির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে — আগুন লাগলে কী হবে মণিকা! সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক্ না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে — তুমি বড় পাষাণ, বুঝলে! বড় পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়— তুমি তো জানই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটুও পাষাণ নয়। বরং বেশি মায়ায় ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ—দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ। সে সুখ-দুঃখ কোন সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করে। তিন বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন, তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভাল।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লিখে, রেডিও বাজিয়ে কখনো বা নিজেই গান গায় গুনগুন করে। সেইসব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চারধারে সেই রঙীন ভয়ঙ্কর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চীৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদার ডেকে বলছে প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখেন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া-বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারের মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড় বেশি কাশে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা উঠে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে—জল খাও তো!

—দাও।

—কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেও।

—দূর দূর! ডাক্তাররা একটা না একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

—খেও না, পায়ে পড়ি।

—আঃ দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

—রোজ তোমার এক কথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো!

—ডাক্তারা কিছু জানে না।

—তুমি খুব জানো।

—আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারী একগুঁয়ে, জেদী। তবু ভেতরে ভেতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকা বলে—নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপরে আছো। এতো ভাল নয়, বুঝলে? কাল থেকে সকালে আর দু' কাপ চা দেবো না, দ্বিতীয় বারে, চায়ের বদলে দুধ দেবো।

—ধুস্।

—ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে! সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট্।

—সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায়?

—তাহলে আমি কী করে থাকি?

—মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান্ পোঁতা হয়ে থাকে।

—তাই নাকি! আর, তোমার জান্ কোথায় পোঁতা আছে শুনি! নতুন করে কারো প্রেমে পড়ো নি তো?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি কিন্তু এ বয়সে কে আর ফিরে তাকাবে বল।

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মনুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমায় খুব দেখছিল।

—যাঃ! তোমার যতো বানানো কথা।

—সত্যি বলছি, মাইরি।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছো তো।

—ও বাবা! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

—কী হল! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?

—তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছো।

—না-গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

—তবে গা ছুঁয়ে বলো।

—না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনো দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলল—তাহলে বলি, তুমি যে বড় দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও সেখানকার সুন্দর মতো সেল্‌সম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

—যাঃ, বলবে না, নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কেন তোমার কাছে জল খেয়ে গেল জানো?

—এই, এই, এমন মারবো না ; কেবল বানাচ্ছ, চুপ করো। ওসব শুনলেও পাপ।

তারা দুজনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যি নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে দুলে পড়ছে—ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রী ব্যাগ্‌স ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে — রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে, ঝাঁটপাট হয়নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুণি, কখন কী হবে বল তো?

ঝি উত্তর দেয়, কি করব বৌদি, বড় বাড়িতে বেশি মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুণি ও বাড়ি দৌড়তে হবে।

—বেশি মাইনে যখন, তখন ও বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইস্কুল, কর্তারও অফিস ন'টায় একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়লোকের বাড়ির বেশি মাইনের কাজ দেখাও।

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন এক নাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন কেবল ঐ কবিতাটা পড়লেই হবে? একটু অঙ্ক বইটা দেখে নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড্ পেয়েছো।

মণিকা—বাথরুম থেকে ক্ষীণ গলায় সঞ্জয় ডাকে।

মণিকা উত্তর দেয়, কি বলছ?

—একটু শুনে যাও।

—দাঁড়াও, আমার হাত জোড়া, ডালে সম্বর দিচ্ছি।

—এসো না।

—উঃ আমি যেতে পারব না। টুকুনের টিফিন বাক্স গোছানো হয় নি, জলের বোতলে জল ভরা হয় নি। এক্ষুণি বাস এসে পড়বে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায়, তার কাশির শব্দ। দম বন্ধ করা সেই কাশি ; তারপরই ওয়াক্ তুলে বমি করার শব্দ হয়।

—ওমা! কি হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—এই কী হয়েছে? এই—ভিতর থেকে উত্তর আসে না, কেবল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা। এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছো কেন?

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা খোলো না।

মণিকা চিৎকার করে ডাকে সুধা, এই সুধা—

সুধা দৌড়ে আসে— কী হল গো বৌদি?

—দ্যাখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

—শরীর খারাপ ছিল?

—হ্যাঁ, তুমি শীগ্‌গির বাড়িওয়ালাকে খবর দাও।

কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অত বড় মানুষটাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে—ধরো আমাকে।

মণিকা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক স্বামীটি তার কী হল, কী হতে পারে মানুষটার?

—কী হয়েছে তোমার ওগো?

—কী জানি, কাশি এল খুব, কাশতে কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।

বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।

—দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।

টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে— কী হয়েছে বাবা!

—কিছু না।

—শুয়ে আছো কেন? আজ তোমার ছুটি?

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে—ছুটি! না ছুটি নয়। তবে বোধ হয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।

—কেন বাবা?

—মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয় নি। তুমি ইস্কুলে যাও।

—যাই বাবা, টা টা।

—টা টা।

বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীরভাবে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দুধটা খেয়ে নাও।

—খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

—আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।
সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।
—না, আর সিগারেট নয়।
—দাও না, মুখটা টক–টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে।
মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেবো না।
ওঃ বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।
—শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলেছিলে?
—কী বলব?
—কিছু বলো নি? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।
সঞ্জয় একটু হাসে —কী শুনেছো?
—ঐটুকু ছেলেকে ঐ সব কথা বলতে তোমার মায়া হল না?
—ওকি বুঝেছে নাকি?
—না–ই বা বুঝল! তুমি বললে কেন? ছুটি মানে কী তা কি আমি বুঝি না?
—কী মানে বল তো?
—বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।
—মণিকা সিগারেট দাও।
—না।
—তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।
—হোক, সিগারেট কিছুতেই দেবো না। আগে বলো কেন বলেছিলে ঐ কথা।
—এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া–বন্দুকে লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কোনোদিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কি? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালবাসে মানুষ তাকে কী করে এক মুহূর্তের খেয়াল–খুশীতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনোদিনই তেমন করে ভালবাসেনি তাকে? সেই জন্যই কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড় সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে? ঐ ছুটির জন্য বড় সাধ সঞ্জয়ের?

মণিকা বিছানার একধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁষে। চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখনো স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনো বলো না।

—আচ্ছা।
—আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।
সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।
—না।
বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায় —বৌদি!
মণিকা বলে—বোধ হয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।
মণিকা বলল—আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।
—কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন?
সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কিছু না। স্মোকারস্ কাফ্।
—দেখি, আপনি ভাল করে শুন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভাল করে। গলার বাইরের দিকে কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে জিজ্ঞেস করেন— এগুলো কতদিন হল হয়েছে?

—কী জানি! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

—ডাক্তারবাবু!

—বলুন।

—কী রকম দেখলেন?

—তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক্।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা, এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনো কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক্ তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। মস্ত চুল ভর্তি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেবল চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে—শুনছো?

—উঁ।

—একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

—একটা সিগারেট দেবে মণিকা?

—না।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ!

মণিকার চোখে জল আসে, বলে··· কোনোদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভাল হও তারপর খেও।

—যদি ভাল না হই?

—ফের ঐ কথা? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে—গলার ঘা-টা একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বাসুকে একবার দেখান।

—আপনার কী মনে হয়?

—কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোন ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরী হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোট সুখ, ছোট দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব-ভালবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড় দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোটো মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড় ঘাম হয় ছেলেটার। একটা মাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তাবিন্দু, মণিকা নিচু হয়ে টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে ওর শরীরের গঠন আর চোখ দু'খানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি, মণিকা ফিস্‌ফিস্ করে ডাকে।

—টুকুন

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওরে টুকুন বেলা গেল। ওঠ্।

টুকুনের উত্তর নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

—টুকুন ওঠ্‌রে, আয় দু' জনে মিলে একটু কাঁদি।

ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্ট অফিসে গিয়ে।

—ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—উনি দিল্লীতে আছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কন্‌ফারেন্সে গেছেন। কাল কি পরশু ফেরার কথা।

—আমার যে ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন।

—দয়া করে বলবেন, ডাক্তার বাসু কিসের স্পেশালিস্ট।

ও পাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসলো, বললঃ ক্যান্সার।

—আমি কাল আবার ফোন করব। কোন্ সময়ে আসার কথা?

—সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকেও যেত পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিরে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানালা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড় একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষ চান্স—এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তার ঠোঁট নড়ে, তার দু' চোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া-বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

—কী হয়েছে?

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে—কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিও রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—সিগারেট আর সিগারেট! সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

—না। মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা, কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন—কি হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া-বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেয়াল ঘড়ি পেণ্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভিতরটা এক হলুদ বেলুন দাঁতে চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়লো মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু হয় নি।

—মানে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

—যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যান্সারের বাতিক, স্মোক করেন?

—করতাম।

—টন্‌সিলটা পাকা ফ্যারিঞ্জাইটিস্ আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

—কি?

—মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম?

—মনে আছে।

—সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে—তুমি কি ভাবো, শেষ চান্সে বেলুনটা না ফাটলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম?

—যেতে না?

—পাগল।

—কী করতে?

—আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফ্‌টিপিন ফুটিয়ে আসতাম বেলুনটায়!

—তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া-বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয় নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বার বার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙীন মেলায় আনন্দিত বাতাস বহে যাক্ এই কতা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে!

কথা

তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে টুপু।

এ কথা প্রায়ই টুপুকে বলার জন্য যায় কুশল। বলা হয় না। কী করে হবে ? টুপু যে বড্ড ব্যস্ত।

কুশল কলকাতায় এসেছে চার বছর। একটা বেসরকারী এঞ্জিনিয়ারিং শেখানোর স্কুল থেকে সে লেদ মেশিনের কাজ শিখেছিল। তার বেশি আর কী করার ছিল তার ? গাঁয়ে তার বাবা মারা গেছে, কিন্তু চাষবাসের জমি আর অল্প-স্বল্প কিছু জীবনবীমার টাকা পেয়েছিল। তাও ভাগিদার অনেক। বিধবা মা আছে, এক দাদা আর এক ভাই আছে, ছোট একটা বোনও। দাদা চাষবাস দেখে, সেই থেকেই সংসার চলে। কুশল কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। তেমন কিছু হয়নি তার। তবে মাথাটা পরিষ্কার বলে সে মেশিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। কিন্তু কাজ পাবে কোথায় ? মূলধনও নেই যে ব্যবসা করবে। সেই এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মালিক সুধীর ভদ্র তখন তাকে ডেকে বলে — তোমার তো বেশ পাকা মাথা, কাজ না পেলে আমার এখানেই শেখাতে লেগে যাও বাপু, হাত-খরচ পাবে, থাকার জায়গাও দেব।

এক অনিচ্ছুক মামাবাড়িতে প্রায় জোর করে থাকত কুশল। তারা তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কুশল বড় মিষ্টভাষী আর সৎ চরিত্রের বলে একেবারে ঘাড়-ধাক্কা দিতে পারছিল না। কিন্তু কুশলের বড় লজ্জা করত। থাকার জায়গা পেয়েসে এবার উঠে এল হ্যারিসন রোডের স্কুলের বাড়িতেই।

তো এই হচ্ছে কুশলের অবস্থা। একশো টাকার কাছাকাছি তার রোজগার। থাকার জায়গার ভাড়া লাগে না, নিজে রেঁধে খায়। কষ্টে তার চলে যায়। তবে কুশল সব সময়েই জীবনের আলোকিত দিকগুলোই দেখতে পায়। যেন জগৎ-সংসারকে দু'ভাগ করে একটা সৌভাগ্যের আলো আর দুর্ভাগ্যের অন্ধকার পাশাপাশি রয়েছে। অন্ধকারে যারা আছে তারা আলোর দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, আবার আলো থেকে অন্ধকারেও কাউকে কাউকে চলে আসতে হয়। কুশল তাই কখনো হাল ছাড়ে না। কিছু হবে, কিছু একটা হবে। হবেই।

তাই এই অন্ধকারের জীবনে ফুল গন্ধের মত, জ্যোৎস্নার মত একটাই আনন্দ আছে। সে হল টুপু।

তাদের গাঁয়ের পুরুতবাড়ির মেয়ে ছিল। বড় সুন্দর দেখতে। কত ছোট্ট ছিল। টুপু এখন কলকাতায় এসে খুব অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব অল্প আয়াসেই টুপু তার দুর্ভাগ্য জয় করে আলোর দিকে চলে গেছে। সিনেমার অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব নাম-ডাক। তার অনেক ভক্ত, অনেক চাহিদা।

কুশলের তাতে কিছু যায়-আসে না। সে মাঝে মাঝে টুপুদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যায়। টুপুর মা আছে, বাবা আছে, একটা ভাইও আছে। তারা এখন সব বড়লোকের মত থাকে। ছোট্ট বাগান-ঘেরা তিনতলা বাড়ি, গেটে দারোয়ান, শিকল বাঁধা কুকুর, হুট বলতে ঢোকা যায় না।

তবু কুশল ঠিকই ঢোকে। তারা আটকায় না। ওরা যে তাকে অনাদর করে তা নয়, উপেক্ষাও করে না। আবার খুব একটা আদর-আপ্যায়নও নেই।

যেমন ওর বাবা বলে — ওঃ কুশল! কী খবর ?

মা বলে—কী বাবা, কেমন! খবর সব ভাল ?

তারপরই আর তেমন কথা–টথা হয় না।

কুশল দেখতে খুব সুন্দর নয়, আবার খারাপও নয়। সিনেমার নায়ক হিসেবে তাকে মানায় না ঠিকই, কিন্তু রাস্তায়–ঘাটে দু' চারজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে। মেশিন চালিয়ে তার চেহারা মেদহীন এবং পোক্ত। মুখশ্রীতে বুদ্ধি এবং অসম্ভব ভালমানুষির ছাপ আছে। সুধীরবাবু টাকা–পয়সার বিষয়ে চোখ বুজে তাকে বিশ্বাস করেন।

টুপুর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। বেশির ভাগ সময়েই তাকে বাইরে থাকতে হয়, নয়তো বাড়িতে ঘুমোয়, নয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ–চৈ করে। তবু দেখা হলে সে–ই সবচেয়ে আন্তরিক ব্যবহার করে। বলে কুশলদা, আজ বাড়িতে খেয়ে যেও। তোমার দাদা কী করছে এখন ? মা কেমন আছে ? পুন্তিকে অনেককাল দেখি না। তার তো বিয়ের বয়স হল!

পুন্তি কুশলের ছোটবোনের নাম। এসব টুপুর মুখে শুনতে বড় ভাল লাগে।

কুশল বড় লাজুক। টুপুর সুন্দর মুখখানার দিকে ভাল করে চাইতে পারে না। মাথা নত করে বলে—আমরা বড় গরিব হয়ে গেছি টুপু।

টুপু বলে—আহা, কী কথা। গরিব হওয়া কি অপরাধ নাকি! এই বলে সান্ত্বনা দেয় টুপু। কখনো বলে তোমার যদি টাকার দরকার হয় তো নিও কুশলদা, লজ্জা করো না।

—না, না, টাকার দরকার নয় টুপু। এই মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাই শুধু। বেশ লাগে।

—দেখে যেও। আমাদেরও ভাল লাগে। তুমি যেন কী করো কুশলদা ?

—একটা এঞ্জিনিয়ারিং কনসার্নে ইনস্ট্রাক্টর।

—ও বাবা, সে তো ভাল চাকরি! বলে টুপু ভ্রূ তোলে।

মিথ্যে কথা বা ফাঁপানো কথা কুশলের মুখে আসে না। তাই সে টুপুর ভুল ধারণা ভাঙার জন্য তাড়াতাড়ি বলে—না না, সে খুব ছোট একটা কারিগরি স্কুল, আর ইনস্ট্রাক্টর বলতে—

কিন্তু অত কথা শোনার সময় টুপুর প্রায়ই হয় না। হয়তো চাকর এসে খবর দেয় যে গাড়ি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। কিংবা ছুকরি একটা সেক্রেটারি এসে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আসল কথাটাই বলা হয় না।

অবশ্য কথাটা যে কী তা আজও ভাল জানে না কুশল। কেবল তার মন বলে—তোমার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা ছিল টুপু।

।। দুই ।।

এত বছর আর তেমন অবসর পেল না কুশল। সুধীরবাবুর স্কুল থেকে একটা পুরনো মেশিন কিস্তিবন্দীতে কিনে নিয়েছিল সে। হাওড়ায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে ব্যবসা শুরু করেছিল। লাভালাভের দিকে তাকায়নি, ভূতের মত খেটে সে সুধীরবাবুর টাকা শোধ করে দিল সময়ের আগেই। আরো একটা মেশিন কিনল। আরো একটা।

ব্যবসা শুরু করলে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়! সেইরকম এক যোগাযোগে সে এক কালোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কিছু টাকা লাগায় তার লোহার কারবারে, বেশ কিছু লাভ পেয়ে যায়। এক বছরের মধ্যে তার গা থেকে হাঘরের ভাবটা ঝরে গেল।

টুপুর বাড়িতে একদিন মিষ্টি–টিস্টি নিয়ে দেখা করতে গেল।

টুপুর বাবা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তার মা খুব বিষণ্ন মুখে একটু খবরাখবর নিলেন। বললেন—বাবা, আর তো দেখি খোঁজ নাও না!

—সময় পাই না পিসি। বড্ড কাজ। অভাব দূর করার চেষ্টা বড় মারাত্মক, হাড়–মজ্জা শুষে নেয়।

—সে তো জানি বাবা। তবু বলি, অভাবই ভাল। প্রাচুর্য মানুষকে বড় অমানুষ করে দেয়।

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার বুঝল না কুশল।

—সুখে থেকো, সৎ থেকো। এই বলেন টুপুর মা।

টুপুর সঙ্গে দেখা হল না! সে ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

সেই কথাটা আজও টুপুকে বলা হয়নি। কী কথা তা অবশ্য সে নিজেও জানে না। হয়তো সে বলতে চায়—তুমি খুব সুন্দর টুপু! কিংবা—আমি তোমাকে ভালবাসি টুপু।

বলেই বা কী হবে ? এসব তো কত লোকেই টুপুকে বলে। তবু বলতে ইচ্ছে করে কুশলের।

লোহার ব্যবসা খুব ভাল লাগছিল না তার। একেই অংশীদারি তার পছন্দ নয়, তার ওপর এক জায়গায় উঠে আটকে যায়। তাই সে মূলধন তুলে নিয়ে লিলুয়ায় নিজের মত ছোট্ট ঢালাইয়ের কাজ শুরু করল। লোহার বড় টানাটানি বাজারে। মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। টাকাও আসে। তুব ঠিক খুশি হতে পারে না সে। একটা কাটিং মেশিন নিলামে কিনল। পাঁচ রকম ব্যবসার কাজে টাকা ঢালতে লাগল। বড় ভাই চাষবাস নিয়ে রইল বটে, কিন্তু ছোট ভাইটাকে আনিয়ে নেয় কুশল। দুই ভাই মিলে সাংঘাতিক খাটে।

টুপুর বাড়িতে যেতে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

—আরে কুশলদা, কেমন আছ ? তোমাকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—না না। দাড়ি কামিয়েছি তো, তাই।

—তার চেয়ে কিছু বেশি। বলে টুপু হাসে— তোমার উন্নতি হচ্ছে বোধ হয়। চেহারায় ছাপ পড়েছে।

কুশল বলে — তোমার চেহারা একটু খারাপ দেখেছি টুপু। কী হয়েছে ?

—কী হবে ? বড্ড ডায়েটিং করতে হয়। খাটুনিও তো খুব।

—আজকাল তোমার ছবি বড় একটা দেখি না তো।

—হচ্ছে। অনেক হচ্ছে। এই বলে টুপু খুব অস্থিরতা আর চঞ্চলতার সঙ্গে একটা সিগারেট ধরায়।

ভীষণ অবাক হয় কুশল। চেয়ে থাকে।

—কিছু মনে কোরো না কুশলদা। নার্ভের জন্য খাই। আমার নার্ভ বড্ড সেনসিটিভ, ধোঁয়ায় একটু শান্ত থাকে।

— বেশি খেও না। দমের ক্ষতি হয়। খুব ভাল আর শান্ত গলায় কুশল বলে।

— বেশি না। মাঝে মাঝে খাই, নেশা-টেশা নেই।

আসলে নেশাই। কুশল সেটা টের পায়।

টুপুর মা দেখা হতে অনেকক্ষণ অন্য কথা বলেন, তারপর বলেন—বাবা, পেটের মেয়ে, পণ্ডিত বংশের সন্তান, বলতে নেই টুপু আজকাল মদও খায়। ভীষণ মাতলামি করে। কাউকে বোলো না।

অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে কুশল বলে—পিসি, খায় তো খাক। তুমি বেশি ঝগড়া-টগড়া কোরো না এ নিয়ে। ওর কাজের স্ট্রেন তো হয়, তাই খায়। ওকে রেস্টোরেটিভ বলে, মদ খাওয়া নয়।

—তুমি বাবা, সব কিছুর ভাল দেখ। আমি দেখি না। ছেলেটাও সিনেমার লাইনে ঢুকবে-ঢুকবে করছে। বারণ করি, শোনে না।

কুশল আবার ভেবে বলে—টুপুর বুঝি আর তেমন চাহিদা হচ্ছে না পিসি ? আজকাল ওকে নিয়ে ছবি হয় না তো।

—হয় না তো কী করবে! জীবনে ওঠা–পড়া আছেই। আমি বলি, এবার ভাল আর সৎ দেখে পাত্র খুঁজে বিয়ে করে ফেলুক! সিনেমার নটী সাজা ঢের হল। ওদের বামুন–পণ্ডিতের বংশের রক্তে কি ওসব সয়!

ভাবতে ভাবতে কুশল চলে আসে।

স্কুলে থাকতে কবিতা পড়েছিল, সন্ন্যাসী উপগুপ্তর সঙ্গে বাসদবত্তার প্রেম হয়েছিল বুঝি! তো টুপুর সঙ্গে একদিন কি তার সেরকমই হবে?

হতেও পারে।

তিন বছরের মাথায় কুশল দেখল, তার অনেক টাকা। শুধু হয়েছে নয়, আসছেও।

ঢালাইয়ের কারখানার জায়গা বদল হয়েছে। ছোট্ট কিন্তু বেশ ভাল একটা ফাউণ্ড্রি খুলে ফেলেছে দুই ভাই। দেশের বাড়ি মস্ত বড় করে করেছে। পুকুর কাটা হয়েছে। চাষের জমিও কিনেছে অনেক। দাদা সে–সব দেখাশোনা করছে। কাজের সুবিধের জন্য একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে কুশল।

সেই গাড়িতে একদিন গেল টুপুর বাড়ি।

টুপু সব দেখে বলল—কুশলদা, তুমি সত্যিই উন্নতি করেছ।

—আরে না, না। কোম্পানির গাড়ি।

—ঐ হল। কোম্পানি তো তোমারই।

কুশল লজ্জা পায়। বড়লোকি দেখাতে সে তো আসে না। সে আসে টুপুকে একটা কথা বলবে বলে।

আজও বলা হয়নি।

।। তিন ।।

টুপু একজন প্রডিউসারকে বিয়ে করল, কুশল খবর পায় এক পত্রিকায়।

গিয়ে দেখে টুপুর মা খুব খুশি নয়।

বললেন—দোজবরে বাবা, আগের বৌকে বিদেয় করেছে। তা টুপুকেই কি রাখবে। বড় ভয় করে। বড়লোকি বিয়ে আমার একদম পছন্দ নয়। বিয়ে ওরা করে না। আসল বিয়ে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে।

পিসি বলেছিল অদ্ভুত।

ওরা হানিমুন করতে জাপান না কোথায় গিয়েছিল। ঠিক তিন মাস বাদে ফিরে এসেই টুপু তার বরকে ডিভোর্স করে।

খবর পেয়ে ছুটে গেল কুশল।

—কী হল টুপু? বিয়ে ভেঙে দিলে?

—দিলাম। ওর হৃদয় নেই।

—আগে জানতে না?

—জানাতাম। তবু ঢুকে দেখলাম আছে কিনা।

—ঢুকতে গেলে কেন টুপু? শরীরটা খামোখা এঁটো করলে।

মুখ–ফস্‌কা কথা। কুশল জিভ কাটল।

কিন্তু টুপু রাগ করল না। খুব অন্যমনস্ক হয়ে বলল—ঠিক বলেছ, এঁটো হয়ে এলাম। তবে অনেক টাকা পেয়েছি।

কুশল বলল—ভাল। টাকাগুলো রেখো। অসময়ে টাকা মানুষকে খুব দেখে।

টুপু এই প্রথম কাঁদল কুশলের সামনে।

বলল—টাকা আর নাম আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে কুশলদা। তুমি তো উন্নতি করেছ, আমি যদি কখনো রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাই তো কিছু ভিক্ষে দিও।

—ছিঃ টুপু, ওকথা বোলো না! টাকা রেখো। আর দরকার হলে নিও আমার কাছ থেকে। লজ্জা কোরো না।

—বড় লজ্জা কুশলদা। বড় লজ্জা।

আলোর পৃথিবী এগিয়ে আসছে।

কুশল বুঝতে পারে, সে নিজে সৌভাগ্যের আলোর চৌকাঠে পা রেখেছে, কিন্তু টুপুর সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ার নয়। কারণ টুপু আলোর জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে চলে আসছে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার জগতে। সে-ও সেই যাত্রাপথে অন্ধকারের চৌকাঠে পা রেখেছে, ঠিক এই সীমানায় তাদের এখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আজও বলতে পারল না কুশল। কিন্তু মন বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে একটা খুব গোপন কথা আছে টুপু।

আজকাল কুশলের সময় বড় কম। কলকাতার ব্রাবোর্ন রোডে তার নতুন শো-রুম আর সেল্‌স অফিস চালু হল। তার ওপর আবার জাপানী একটা কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে চাষের যন্ত্র লাঙল তৈরি করবে বলে সে গেল জাপান। ঐ পথে দূর-প্রাচ্যের সব দেশ দেখে এল। কারখানা খোলার জায়গা পেল কলকাতার কাছেই। বড্ড পরিশ্রম গেল ক' দিন। বয়সও তো প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হয়ে গেল। এখন শরীর না হোক মনটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মা বিয়ের তাগাদা দেয়। কুশল রাজি হয় না। ছোট বোনের বিয়ে দিল বড়লোকের বাড়িতে। সেই বিয়েটা আসলে একটা অলিখিত চুক্তি। আত্মীয়তার সূত্রে যাদের পেল তারা সমাজের ওপর তলার ভাল সব যোগাযোগের মধ্যমণি। এই সব বুদ্ধি এখন মাথায় খুব খেলে কুশলের।

কিন্তু তবু ক্লান্তি তো ছাড়ে না। যোধপুরের প্রকাণ্ড বাড়িতে ফিরে যখন কখনো অবসর কাটায় তখন বড় একা আর ক্লান্ত লাগে। মেয়েলি স্পর্শ জীবনে বড় দরকার। মেয়েরা হল পুরুষের বিশ্রাম, একটু সৌন্দর্য, আশ্রয়।

কিন্তু বিয়ে করবে কী করে কুশল? সেই কথাটা যে আজও টুপুকে বলা হয়নি। তাই সে ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। অনেকদিন ধরেই এক সরকারী হর্তাকর্তা তাঁর মেয়েকে কুশলের ঘরে দেওয়ার জন্য অস্থির। কুশল তাঁকে তাই বিমুখ করল না। নিজে বিয়ে না করে ভাইয়ের সঙ্গে দিয়ে দিল।

আজও বড় লাজুক কুশল, এখনো যতদূর সম্ভব সৎ ও সচ্চরিত্র। এখনো তার চেহারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ রয়ে গেছে।

খুব সকালবেলায় একদিন একটা পুরোনো গাড়িতে টুপু এসে তার বাড়ির সামনে নামল। খুবই কুণ্ঠিত আর লজ্জিত ভঙ্গিতে এল ভিতরে।

বলল—তুমি কী ভীষণ বড়লোক হয়ে গেছ! কী করে হলে?

লজ্জিত কুশল বলে—শোনো টুপু ওসব কথা বোলো না। মেয়েরা টাকা-পয়সার কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আমার খবর জানো?

—জানি টুপু, তুমি আজকাল একদম কন্ট্রাক্ট পাচ্ছ না। খবর নিয়ে জেনেছি, তুমি অনেক টাকা চাও বলে কেউ তোমাকে ছবিতে নেয় না। তার ওপর তুমি শুটিংয়েও যাও না ঠিকমত।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আরো আছে। আমি নাকি নতুন নায়কদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছি। প্রায়ই নাকি ইউনিট থেকে তাদের কাউকে নিয়ে ইচ্ছেমত চলে যাই ফূর্তি করতে। এসব শোননি?

—শুনেছি।

—বোগাস। এর কিছুই সত্যি নয় কুশলদা। এখন আমি ঘর থেকে মোটেই বেরোই না। অন্ধকারে বসে বসে কাঁদি।

—কেন কাঁদো টুপু? তোমার দুঃখ কী?

—বোঝ না ? মানুষ যখন গুরুত্ব হারায়, যখন নিজের ধর্ম থেকে, ভিত থেকে নড়ে যায় তখন যে দুঃখ, তার তুলনা নেই।

—বাজে কথা টুপু। তুমি গরিব বামুনের মেয়ে। তোমার ধর্ম বল, ভিত বল, গুরুত্ব বল, তার কিছুই তো তুমি পাওনি। যা পেয়েছিলে, যে অর্থ, যশ ও গুরুত্ব, তা তোমার পাওনা জিনিস ছিল না। একটু ভেবে দেখো।

—তবে কী আমার পাওনা ছিল ?

কুশল ভেবে বলে—বোধ হয় ভালবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করার তৃপ্তিই মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

—ও বাবা, তুমি খুব কথা শিখেছ আজকাল। শিখবেই, বড়লোক হয়েছো তো। বড়লোকদের সব কথা বলবার অধিকার আছে।

কুশল যন্ত্রণায় কাতর স্বরে বলে—না টুপু। আমাকে বড়লোক বোলো না। আমি চেষ্টা করছি মাত্র। চেষ্টাই মানুষের জীবন। বিষয়ের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন কি সবার হয় ?

—আমি অত বুঝি না কুশলদা। আমি বলতে এসেছি আমি একটা ছবি প্রডিউস করব। টাকা দাও। শেষবার একটা চেষ্টা করে দেখি।

—দেব। কুশল বিনা দ্বিধায় বলে।

।। চার ।।

উপগুপ্ত আর বাসবদত্তার কবিতাটার শেষে যা ছিল, তাই বুঝি ঘনিয়ে আসে। ছবিটা একদম চলল না। কুশল জানত, তাই টাকাটাকে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিল।

প্রেস শোতে তার পাশেই বসেছিল টুপু। বলল—চলবে না, না গো কুশলদা ?

কুশল খুব দুঃখিত মনে মৃদুস্বরে বলে—বোধ হয় না।

—কেন কুশলদা ? আমি তো আমার সর্বস্ব দিয়ে অভিনয় করেছি, গল্পটাও ভাল ছিল। সবই চেষ্টা করেছি।

কুশল তেমনি মৃদুস্বরে বলে—টুপু, কেন এত করলে ? এর চেয়ে অনেক কম কষ্টে সুখী হওয়া যেত জীবনে।

বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টুপু একটা আপার্টমেন্টে থাকে এখন। একা একা। মা আর ভাই আলাদা থাকে। তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না টুপুর।

তার সেই অ্যাপার্টমেন্টে বিরাট পার্টি দিয়েছে টুপু তার জন্মদিনে। কুশলকে নিমন্ত্রণ করেছে। কুশল সময় পায় না, তবু সময় করে গেল পার্টিতে।

গিয়ে দেখে, ফ্ল্যাটটা একদম ফাঁকা। রাশি রাশি খাবার সাজানো টেবিলে, ঘরদোরে প্রচুর আলো, সাজগোজ। তবু কেউ নেই। এমন কি একটা বুড়ি ঝি ছাড়া অন্য কাজের লোকও কেউ নেই। টুপু একটা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরে এলোচুলে জানালার ধারে বসে বই পড়ছে। মুখটা ম্লান, কিন্তু প্রসাধনহীন বলে তার সেই কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ফুটে আছে।

কুশল অবাক হয়ে বলে—কী হল, লোকজন সব কই ?

টুপু বই বন্ধ করে হেসে উঠে আসে, বলে—লোকজন! তারা আবার কারা ? কাউকে বলিনি তো! শুধু তোমাকে।

—তাহলে এত আয়োজন দেখছি কেন ?

টুপু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে কুশলের মুখের দিকে। তারপর খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলে—শোনো, আমি জীবনে দেদার পার্টি দিয়েছি। পার্টির শেষে যখন সবাই চলে যায়, তখন এঁটো বাসন, শূন্য মদের বোতল, ভাঙা কাঁচ, দলিত ফল সব পড়ে থাকে। ঘরটা বীভৎস লাগে। মনে হয় পরিত্যক্ত, ভূতুড়ে। তাই আজ কাউকে বলিনি।

—আমাকে যে বললে!

—তুমি! ওঃ, তোমার কথা আলাদা। আজ আমরা দু' জনে পার্টি করব। আর আমাদের চারদিকে শূন্য চেয়ার, ফাঁকা ঘর, আর নির্জনতা থাকবে। কুশলদা, তোমার একার জন্যই আজ পঞ্চাশজনের আয়োজন। তুমি সব এঁটো করে নষ্ট করে যাও! আমি দেখি।

—পাগল! কুশল বলে।

—আমি পুরুষকে লজ্জা পেতে বহুকাল ভুলে গেছি। কিন্তু জান, আবার খুব ইচ্ছে করে লজ্জা করতে। আমাকে একটু লজ্জা দাও কুশলদা।

—পাগল! কুশল বলে।

—শোন, তুমি ভাবছ আমি মদ খেয়েছি। না গো, এই দেখ, শুঁকে দেখ মুখ! বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এই বলে ছোট্ট সুন্দর মুখখানা হাঁ করে কাছে এগিয়ে আনে টুপু।

কুশল ওর মুখের বাতাস শুঁকল । কি সুন্দর গন্ধ! ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে।

টুপু শ্বাস ফেলে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আজ আমার জন্মদিন কুশলদা। তুমি আমাকে কী দেবে?

সোনার একটা গয়না এনেছে কুশল। কিন্তু সেটা বের করল না। একটু ভাবল। তারপর বলল—টুপু, বহুকাল হল তোমাকে একটা কথা বলার চেষ্টা করছি। আজ তোমাকে সেই কথাটা বলি বরং। সেইটেই জন্মদিনের উপহার বলে নিও।

—কথা! বলে টুপু হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে— এতদিন বলনি কেন?

—সময় হয়নি। কথারও সময় আছে টুপু।

টুপু হেসে মাথা নিচু করে লজ্জায়। তারপর অল্প একটু শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বলে—আজ বুঝি সময় হয়েছে?

—হ্যাঁ। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এবার বলি। টুপু····

টুপু দু' হাতে কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে পড়ি, বোলো না, বোলো না তো! বললেই ফুরিয়ে যাবে।

—বলব না? কুশল অবাক।

টুপু স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসল, বলল—সারা জীবন ধরে ঐ কথাটা একটু একটু করে বোলো। কথা দিয়ে নয়, অন্যরকমভাবে।

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ। মাথার নিচে হাত, হাতের নিচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভাল নেই ক'দিন। সর্দি। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভাল লাগছিল না।কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়েছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বৌ অঞ্জলিকে। খুব ভিড়ের একটা ডবলডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নিচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠাবার চেষ্টা করছে, পিছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে চারিদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো, কাঁদো কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে, কোনদিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি করে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাব করছে। চারিদিকে রাগী, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেচাঁচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাসুদ্ধ অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভিড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল—আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে–এ। নামো শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিসফিসের মত শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কণ্ডাক্টার ডবল ঘন্টি বাজিয়ে দিচ্ছে··· অঞ্জলির কী যে হবে।

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুমন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বৌ নয়। মাস ছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন তার পেটে মাস দু'য়েকের বাচ্চা। এতদিনে বোধ হয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাস দু'য়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তা ছাড়া অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সম্পর্কহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোটো বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন—ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরত দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোট বোনের বিয়ে আর দু'মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই কটা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলায় তারপর দায়ের করো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়বো না।

অঞ্জলি ফেরত গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু'মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কি ন' মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে, অঞ্জলির কথা সে এখনো ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায় ?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাশ। একটা সেকেণ্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ্ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি, ইউ–তে এখনো ছেলে ভর্তি হয়নি, পার্ট টু বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু' দিন ছুটি থাকে তার, অন্যদিন একটা দুটো ক্লাশ নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভাল না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু–আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ঐ ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করেছিল ঠিকই। বোধ হয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এখন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ঐ দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফথ্ পিরিয়ডের ক্লাশটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশু শরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতো।

এত বড় জোচ্চুরি যে টেঁকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না ? তার বাবাও কি জানত না ? তবে তারা খামোখা কেন ঐ কাণ্ড করল ? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারা জীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ? কী রকম বোকামি এটা ? দু' মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল! কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে–বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কিনা কে জানে।

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর, রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবলডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা তার সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের অভ্যন্তরীণ ময়লায়, কাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে। গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে ? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভিড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনোদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে— কোথায় যাবেন ?

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে — সোজা চলুন, বলে দেবো।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার! তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারো কথাই তার মনে পড়ে না, যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও ভেবে পায় না সে যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকসহীন। গত কয়েক মাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এদিক–ওদিক ঘোরালো সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরে–ফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় ভালই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গির কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঃঝুম। কয়েকটা দামী বিদেশী গাড়ি এধারে – ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চম্‌কি রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভাল লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। গত ছ' মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা ? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালোবেসেছিল বলে বিবমিষা ? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারের পাদানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোন মানে না থাক্, গত ছ' মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়ছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে, এবং এই ভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে মন্দার। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলি দেখতে ভাল, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি–এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রঙ চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল— তুমি প্রেগন্যান্ট ?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল—আমার বাবা এই বিয়ে জোর করে দিয়েছেন, আমি চাইনি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কিনা বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস্!

অঞ্জলি তবু কাঁদেনি, কেবল ভয় পেয়েছিল! কী হবে তা অঞ্জলি বোধ হয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সরে–যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়! গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর, অন্য মনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারী বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাশ ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার…

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, কটা কথা বলতে

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জলুস নেই। রঙ ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আল্‌গা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—কিছু মনে করলে না তো।

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোন দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—বাবাজীবন, তুমি ?

—আমিই।

—এসো এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছাল।

—বসবে না ? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিজ্ঞেস করে—কী খবর ?

—খবর আর কী ? কোনো রকম। বুড়ো গলা–খাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়! বলে—সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন —কী চাও মন্দার ? ওকে কিছু বলবে ?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—ভিতরে বাঁদিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কিনা কে জানে। অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে—কবে হল ?

—আজ আট দিন।

—ভাল আছো ?

—না। খুব কষ্ট গেছে।

—আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ঐ চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে ?

—বলব।

—কী ?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও ?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে ?

বিস্ময়ে চোখ বড় করে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক ?

—ঐ বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন ? তাকে তো আমি ভালবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী করে হল ?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি ? তবে কী প্রশ্ন ? কী প্রশ্ন ?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না ?

—বিয়ে! অবাক হয় অঞ্জলি, বলে— তা কি সম্ভব ? সে কোথায় চলে গেছে। তাছাড়া আমি তা করতে যাবো কেন ? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে!

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে— তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও ?

—না। তুমি অনেক দিয়েছো।

—কী দিয়েছি ?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি ?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলে—থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরী কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই ?

—না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েক মাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর ষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন ?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং! শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কি হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছো, তোমাকে কেউ আদর–যত্ন করার নেই। দেখ তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ হয়ে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুণি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে —অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা ফোলা, শরীরও তাই। বোধ হয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে— তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে ?

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নিচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমার এখন অফ্ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাশটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে —পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে —তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

—মনে করলেই ছুটি।

—কোথায় যাবে?

—আমি কী জানি! যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বৌ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা-সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ্য করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়েছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শকাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে—বলল—আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। অন্য কোনো দিন আসবো!

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে —আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। তুমি বুঝবে না।

—বুঝবো না কেন?

—আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পা-দানি, ভিড়, টাল-মাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে ছিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক হলেন।

বাপ বেটিতে খুব অবাক হয়। তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকেবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারী মুস্কিল।

মন্দার উত্তর দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে—বাবার দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলি সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়...অঞ্জলি চুপ করে থাকে। একটু কাঁদে ঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কী একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুবই জরুরী।

—বলো।

—বললাম তো মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা কলের।

মন্দার একটু-আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়! মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাবো? অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

—ভাবি!

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালবাসার কথা সহজে ভোলে, প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার। আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি।

—কী শোধ নেবে বলো?